KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ [illegible], কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title [illegible]	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩০/৯ ৩০/১০ ৩০/১১	Year of Publication : পৌষ ১৩৯৯ // Jan 1993 মাঘ ১৩৯৯ // Feb 1993 ফাল্গুন ১৩৯৯ // March 1993
	Condition : Brittle · Good
Editor [illegible]	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫০ সংখ্যা ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বর্তমান বিপর্যয়ের রহস্যোদ্ঘাটন প্রয়াসে অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যের সন্দর্ভ 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্র : একটি সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ধারাভাষ্য'।

মন্দির ধ্বংস এবং মুসলিম শাসনে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে বর্তমানে যেসব প্রচার চলছে সেসবের কতখানি রটনা এবং ঘটনা— এই প্রসঙ্গে অজস্র তথ্যসূত্র উল্লেখ করে নিবন্ধ লিখেছেন গৌতম রায়।

ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শ যাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল সেই মৌলানা আজাদের মমান্তিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? মূলতঃ এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ভ 'জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আজাদ'।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এবং চলচ্চিত্রে ভারতীয় নারীর সঙ্কট অনুধাবনের প্রয়াস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পর্যালোচনা করেছেন ড.অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়।

'জীবমণ্ডল নিষ্প্রয়োজন ভেবে মানুষ যদি বিবেকহীন হয়ে প্রযুক্তি মণ্ডলের দিকে খুব বেশি ঝুঁকে পড়ে...ধ্বংস অনিবার্য।' এটাই ধারাবাহিক 'মাটি' রচনার বর্তমান কিস্তির আলোচ্য বিষয়।

'মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের প্রয়াস' —একটি গবেষণা-সমৃদ্ধ আলেখ্য।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

চতুরঙ্গ
বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ১০
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
মাঘ ১৩৯৯

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র : একটি সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ধারাভাষ্য সৌরীন ভট্টাচার্য ৬৪৪
জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আজাদ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ৬৬৯
মন্দির ধ্বংস, মুসলিম শাসনে হিন্দু নির্যাতন : রটনা এবং ঘটনা গৌতম রায় ৬৭৩
'ঘরে বাইরে'—ভারতীয় নারীর সঙ্কট : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এবং সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭৮

মাটি সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৬৯২

কবিতা

অনেকদিন পরে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৬৫৫
যা কিছু জরুরি সন্তোষ চক্রবর্তী ৬৫৬
অভিনব রামরাজ্য উর্মিলা চক্রবর্তী ৬৫৭
বিদ্যাসাগর শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৬৫৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গল্প

সাপ লুডো জয়কৃষ্ণ কয়াল ৬৬৪

গ্রন্থ সমালোচনা

জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রহসন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮৯
সোনার বাংলার স্বপ্ন সনাতন মিত্র ৭০০
ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এবং অকতাভিও পাথ-এর কবিতা কমলেশ সেন ৭০৩
তিনটি উপন্যাস : সমকাল, ভূত এবং ভবিষ্যৎ মেঘ মুখোপাধ্যায় ৭০৭
সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার কয়েকজন কামাল হোসেন ৭০৯
স্ত্রীদেবতা কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৭১১

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের প্রয়াস কান্তি গুপ্ত ৭১৪
ডাঃ মহম্মদ আবদুল ওয়ালি ৭১৮

মতামত

বিদ্যাসাগর বিষয়ে ভুল তথ্য দেবব্রত ঘোষ ৭১৯
প্রসঙ্গ কবি অমিয় চক্রবর্তী কল্যাণকুমার দত্ত ৭২০
শিক্ষাসংকট নিয়ে কিছু অনীশ লাহিড়ী ৭২১
প্রসঙ্গ হিন্দু মৌলবাদ দেবদাস জোয়ারদার ৭২২

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত
অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলি-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

Hindustan Wires Limited

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 242-6745 (3 lines)
242-6746
242-6747

Telegram : WIREFIELD

Factory :

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of :

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &
MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED
JAPAN

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র : একটি সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ধারাভাষ্য

সৌরীন ভট্টাচার্য

একটা কথা গোড়াতেই পরিষ্কার বলে নেওয়া ভাল। প্রাক্তন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে এই প্রবন্ধে যে আলোচনার অবতারণা করা হচ্ছে তার লক্ষ্য কিন্তু মূলত আমাদের নিজেদের পরিস্থিতি। আমাদের সমাজ রূপান্তরের গরজেই আমরা ঐ ভাঙনের ইতিহাস বুঝে নিতে চাই : কথাটা উঠছে এই জন্য যে সোভিয়েতের ইতিহাসে কোথায় কী ভুল হয়েছিল, সেখানে সমাজতন্ত্র গড়তে গিয়ে কোথায় কী ভাবে এগোলে বিপর্যয় ঠেকানো যেত এ নিয়ে পরামর্শ বাতলানো আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। এতটা দূরে বসে শুধু বই পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে সেই বোধ তৈরি হওয়া শক্ত যার জোরে ঐ পালা বদলের মর্মে পৌঁছনো যেতে পারে। আর তা ছাড়া বই বা পত্রপত্রিকাই বা কতটুকু পাই আমরা? সত্যিকার নির্ভরযোগ্য তথ্য বই পত্রপত্রিকাতেই বা কতটুকু পাওয়া যেতে পারে? অনেক দূর ভবিষ্যতে নতুন গবেষণায় হয়ত এমন কোনও চাঞ্চল্যকর তথ্য কোনদিন বেরোবে যখন মনে হবে অনেক কথা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু এসব ত পরের কথা। আজ? যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ তথ্য হাতে নেই বলে কি আজ আমরা চুপ করে বসেই থাকব? চলমান ঘটনাবলির বিশ্লেষণের জন্য আমরা প্রস্তুত হতে পারিনি বলে ঘটনা বা তার প্রতিক্রিয়া ত আমাদের পাশ কাটিয়ে যাবে না। কাজেই সে সব মোকাবিলা করবার জন্য যেভাবেই হোক আমাদের খানিকটা তৈরি থাকতেই হবে।

এই তৈরি থাকবার একটা উপায় হল যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা, একপেশে তথ্য চিনে নিতে শেখা, চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। কিন্তু এতে কিছুতেই সবটা হবে না। অন্য পরিস্থিতি বিষয়ে যা কিছু জানতে পারছি, যা মনে হচ্ছে তা নিজের পরিস্থিতির চেনা প্রসঙ্গের কথা মাথায় রেখে যাচাই করে নেওয়া উচিত। এখানে আবার অন্য একটা বিপদ থাকে। অন্য পরিস্থিতির সবকিছু নিজের মত করে বুঝে নেবার তাগিদে নিজের চেনা ছকে ফেলে বিচার করার একটা ঝোঁক দেখা দিতে পারে। সেটা কিন্তু কোন কাজের কথা নয়, সবকিছু আমার চেনা আদলে হবে কেন? অন্য আদলের জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে হয়, অন্য আদলকে স্বীকৃতি জানাতে পারলে তবে ঐ অন্য পরিস্থিতিকে হয়ত কিছুটা বুঝেও নেওয়া যাবে, আর তাকে খানিকটা নিজের কাজেও লাগানো যাবে। নিজের পরিস্থিতি আর অন্য পরিস্থিতি এই দুইই আলাদা করে যেমন চিনে নিতে হবে তেমনি তাদের মধ্যে চলাচলের সড়কগুলোকেও আবিষ্কার করে নিতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে ওরকম কট্টর জল অচল ভাব চলে না। যাতায়াত চাই, পারস্পরিক মুখ দেখাদেখি অনেক সহজ হওয়া চাই। এরই পাল্টা ভাবটাকে সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, কূপমণ্ডুকতা ইত্যাদি নানা অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। এসব জিনিস অবশ্যই পরিহারযোগ্য, কিন্তু তাই বলে নিজেদের পরিস্থিতি আর অন্য পরিস্থিতির মধ্যে কোন ফারাক নেই তাও ত ঠিক নয়। ফারাক আছে বলেই এবং নিজেদের গরজের জন্যই ঐ যাতায়াতের পথ করে নিতে হয়।

এই যাতায়াতের পথ তৈরি করে নিতে গিয়েই বোধ ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। শুধু তথ্যে, শুধু পরিসংখ্যানে, এমনকি শুধু খানিক ব্যক্তিগত পরিচয়েও অনেক সময়েই ঐ অন্ত পরিস্থিতির মর্মে পৌঁছনো যায় না। তা হয়ত কোন-মতেই যায় না। তবে মর্মে পৌঁছনো বলতে যে কী বোঝায় তাও হয়ত খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু একটা কিছু আন্দাজ ত গড়ে তুলতেই হয় এবং সে-আন্দাজেরও চারপাশ বেশ খানিকটা খোলা রেখে এগোনো ভাল যাতে অদল বদল করার জায়গা থাকে। আমি যাকে বোধ ও কল্পনা বলে ভাবতে চাই এই আন্দাজ গড়ে তোলার কাজে তা খুব জরুরি। এই কল্পনা নেহাতই কাল্পনিক নয়, নিজের পরিস্থিতিকে মন দিয়ে জরিপ করতে করতে এগোলে, এবং পদে পদে ঐ অন্ত পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে এই কল্পনাটার দরকার পড়ে। এবং এই পথে ঐ কল্পনার গায়েও রক্তমাংস লাগে। এই বোধ ও কল্পনার ব্যবহার বাদ দিয়ে এগোতে গেলে তথ্য ও পরিসংখ্যানের হিসাবটা হয়ত মিলিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু ঐ আন্দাজটা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটাই যে কী কাজে লাগে তা বলা শক্ত। নিজের কাজে লাগাতে গিয়ে নিজের ভিতরে দিকে ঠিকমত টান দেওয়া চাই।

সাবেক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপে পট পরিবর্তন, তথাকথিত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান, মার্কিন মুলুকের প্রায় একাধিপত্য ইত্যাদি ঘটনা আমাদের সময়ের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থে যুগান্তকারী। নতুন বিশ্ববিন্যাস যাই দাঁড়াক, তা যে অনেকখানি নতুন চেহারা নেবে এটুকু বলাই চলে। এর থেকে আবার উল্টো দিকে বেশি সরে গেলেও বিপদ। অনেকেই ত বলে ফেলছেন বা ভেবে বসছেন যে সমাজতন্ত্রের অসম্ভাব্যতা ত প্রমাণ হয়ে গেল। কোনও কিছুই ঠিক অত সহজে প্রমাণ হয় না, ইতিহাসে ত নয়ই। বর্তমানের রাশিরাতে, এখনকার মস্কোতে অন্ত হাওয়া ইতিমধ্যেই কিছু কিছু লাগছে। কমিউনিস্ট আমলের গোলমাল নিয়ে ত এত কথা শোনা গেল, আর যা শোনা গেল তার অনেক কিছু হয়ত ঠিক, কিন্তু তবুও নতুন জমানায় ত বেশি কিছু বোধ হয় সুবিধে হচ্ছে না। এবার মস্কোয় নাকি শীত কিছু কম, শূন্য ডিগ্রির নিচে দশ বারো ডিগ্রি তাপমাত্রা নেমে গেলে যেখানে মস্কোবাসীর মনে হয় স্বাভাবিক সেখানে এবার এখন নাকি চলছে শূন্য ডিগ্রির ওপরে তিন ডিগ্রি মত। মস্কোতে নাকি একটা রসিকতা খুব চলছে যে এমন কি শীতেও কমিউনিস্টদের সময়ে ভাল ছিল। ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হতে যে শীতও এমনিভাবে শেষ হবে সেটা যেন ঠিক মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষের মেজাজটা আবারও হয়ত বদলে যাবে কে জানে। খুব স্থির কিছু নেই বেশি। অ-স্থির বদলের কথা মাথায় নিয়েই বোঝাপড়া করতে হয়, আন্দাজটা গড়ে তুলতে হয়।

সোভিয়েতের ভাঙনপর্বে সব যেন হুড়মুড় করে ভেঙে গেল। যা যা ভাবা হয়েছিল সবই যেন অলীক মনে হল। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ জোরদার হয় নি, জাতি-সমস্যার সমাধান হয় নি, সমাজতন্ত্রের নতুন মানুষ গড়ে ওঠার কথা ছিল, তার কী হল? এ সব প্রশ্ন ত উঠবেই। সত্তর-পঁচাত্তর বছর সময় কি তাহলে একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল? আমাদের এখানে ক্ষুব্ধ অভিমানে এ প্রশ্ন উঠছে, উঠবেই: আমাদের যে-সব নেতারা অনবরত মস্কোতে যেতেন, সভা সমিতি কিংবা সম্মেলনে, চিকিৎসায়—তাঁরা কিছু টের পান নি? টের পেলে কিছু বলেন নি কেন? টের না পেলে, কেন পান নি? চোখ কান খোলা ছিল না বলে? না জানতে বুঝতে দেওয়া হয় নি তেমন করে? দেওয়া যে হচ্ছে না তাও কি বুঝতে পারা যায় নি? এসব প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে লাভ নেই। মেনে নেওয়া যাক আমরা মাতাল ঝোঁকে অনেক কিছু না দেখা না শোনা না বোঝা না জানার ভান করেছি। সেটা ভাল করি নি। সেভাবে সমাজতন্ত্রের কোনও উপকার করা যায় নি। সেভাবে শুধু প্রতিপক্ষের খুঁত ধরে কী হবে? এই ভাঙন পর্বের গোড়ার দিকে ভূপেশ ভবনের এক সভায় শ্রীযুক্ত জলিমোহন কল স্বগতভাষণের মেজাজে যখন উচ্চারণ করেন যে আমাদের সব সমালোচনাই 'বুর্জোয়া অপপ্রচার' বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি তখন তিনি একটা জরুরি জায়গাই ছুঁয়ে যান। আমরা ত নাছোড় অবুঝ হয়ে অনেক দিন কাটিয়েছি। খুব বেশি কিছু ভাবিও নি। যান্ত্রিক সূত্রাকার বচনের নিরিবিলিতে বেশ নিরাপদ ভেবেছি নিজেদের।

তাসের ঘরের এই ভাঙনটাকে অর্থনীতির দিক থেকে দেখা যাক। শুধু অর্থনীতির দিক থেকে দেখার অবশ্য বেশি কোন মানে নেই। সব কিছুর থেকে আলাদা হয়ে অর্থনীতির ভালমন্দ বলে ত কিছু হয় না। সবই মিলে মিশে থাকে। কাজেই অর্থনীতির কথা ভাবতে গিয়েও আসলে অন্য অনেক

কিছুর কথাই ভাবতে হবে। গোটা ছবিটাই দেখবার চেষ্টা করতে হবে। উৎপাদন, বণ্টন, শ্রম ও পুঁজির আচার-আচরণ এসব ত মানুষের গোটা সমাজ জীবনধারার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কাজেই সেই গোটা জীবনধারার ব্যাপারটা একেবারে এড়িয়ে গিয়ে অর্থনীতির সংকট আলোচনা বা অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টায় বিশেষ লাভ হবে না।

অর্থনৈতিক বিচারে সমাজতন্ত্র আদৌ সম্ভব কিনা এ নিয়ে তিরিশের দশকে অর্থনীতির তাত্ত্বিকদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক চলেছিল। তখনকার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত অর্থনীতি নিশ্চয়ই এই বিতর্কের পটভূমি হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে সবার মাথায় ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম খসড়া আকাদেমিসিয়ান স্ত্রুমিলিনের নেতৃত্বে ১৯২৬-এই তৈরি হয়ে গেছে। এই পরিকল্পনার সময়সীমা ছিল ১৯২৫-২৬ থেকে ১৯২৯-৩০। পরিবর্তিত খসড়া তৈরি হয়ে যায় এর পরের বছরই; এই খসড়ার সময়সীমা ছিল ১৯২৬-২৭ থেকে ১৯৩০-৩১। এইসব খসড়ার পরিবর্তন পরিবর্জন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যখন প্রথম পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা ও বাদ বিতণ্ডা চলছিল। এই বিতর্ক যে বিদেশের তাত্ত্বিকদেরও স্পর্শ করবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রথম পর্বের এই বিতর্কের মধ্য থেকে দুটো জিনিস একটু লক্ষ করা দরকার। একটা হল পরিকল্পনা বা তার খসড়া তৈরি করার টেক্‌নিক্যাল সমস্যা আর দ্বিতীয়টা হল পরিকল্পনার অন্তর্গত অর্থনৈতিক নীতির সমস্যা।

টেক্‌নিকাল সমস্যার খুঁটিনাটি নিয়ে পরিকল্পনার এই প্রথম পর্বে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর জল্পনা-কল্পনা ছিল। একটা গোটা দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা ত এই প্রথম। এর আগে যে শুধু এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা কারও ছিল না তাই নয়, ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব কিনা এ নিয়ে প্রচুর সংশয় ছিল অনেক তাত্ত্বিকের মনে। এই নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থনীতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যেটা সবার মাথায় ছিল তা হল বাজার-ভিত্তিক মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতি। যদিও এখানে মনে রাখা দরকার যে ধারণা হিসেবে পুঁজিবাদ ও বাজার এক নয়, আবার সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পনাও আলাদা। খানিকটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার জন্যই অনেক সময়ে আমাদের চিন্তায় ও কথাবার্তায় এই ধারণাগুলো একটু মিলে মিশে থাকে। তিরিশের বিতর্কে যাঁরা মনে করছিলেন যে নিতান্ত টেক্‌নিকাল কারণেই পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতি বানচাল হতে বাধ্য তাঁদের যুক্তিটা ছিল মোটামুটি এই রকম। একটা অর্থনীতি সুষ্ঠুভাবে চালু রাখার জন্য নানারকম হিসাবপত্রের প্রয়োজন পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল উৎপাদিত দ্রব্যাদির দামের। এই চিন্তার ভিত্তিতে আছে বাজার নামক এক প্রতিষ্ঠান। তারও গোড়ায় আছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার ফলে উৎপাদনের প্রয়োজনে সম্পত্তি ব্যবহার করতে গেলে কিছু না কিছু বিনিময়ের প্রশ্ন উঠে পড়ে। এই বিনিময় চলে দামের মাধ্যমে। যেহেতু প্রধানত সব দ্রব্যই ক্রমশ এই বিনিময়ের আওতায় এসে পড়ে তাই দ্রব্য ও নানা রকমের সেবা ক্রমে ক্রমে পণ্যের চরিত্র অর্জন করে। ব্যক্তিগত মালিকানা, বাজার, দাম ও পুঁজিবাদী কাঠামো এইভাবে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে থাকে। এই কাঠামোর প্রসঙ্গে তাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে কিছু কিছু আদর্শ অবস্থা বজায় থাকলে এই ধরনের বাজারে পণ্যের যে-দাম নির্ধারিত হবে তাতে করে সব পণ্যের ক্ষেত্রেই তাদের চাহিদা ও জোগানে সমতা আসবে। বস্তুত এই সমতার জন্যই এই দামগুলোকে বলা হয় সাম্যাবস্থার দাম। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তির ও উৎপাদনের সব রকমের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত অধিকার বজায় থাকার ফলে প্রত্যেক উপকরণের ক্ষেত্রেই গড়ে উঠছে তাদের বাজার। এবং সেই বাজারে উৎপাদনের উপকরণের যে-দাম নির্ধারিত হচ্ছে তার ভিত্তিতেই যে-কোনো পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। সেই উৎপাদনের ব্যয় ও সেই পণ্যের চাহিদার ভিত্তিতে আবার নির্ধারিত হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যটির দাম। এই দামে বিনিময় হলে পণ্যটির চাহিদা ও জোগানে সমতা আসছে। এই ছবিটাকেই বাজারের শৃঙ্খলা বলে বলা হয়। শৃঙ্খলাপূর্ণ এই নিয়মিত বাজার প্রক্রিয়ায় কেউই ত কোনও কিছু জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে না। সবই যেন যেমন যেমন হওয়া উচিত ছিল বা স্বাভাবিক ছিল ঠিক যেন তেমন তেমনই হচ্ছে। এই বাজার তন্ত্রের প্রবক্তাদের কাছে এটাই স্বাধীনতার নিরিখ, অন্য কোন ব্যবস্থায়, বিশেষত পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যবস্থায় তাঁরা স্বেচ্ছাতন্ত্রের চিহ্ন দেখে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তিরিশের দশকের বিতর্কে

লুড্‌ভিগ্‌ ফন্‌ মিজেজ ও ফ্রিড্‌রিশ হায়েকের মত প্রবল তত্ত্বব্যক্তিত্বের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল এই বাজার তন্ত্রের প্রতি। এঁরা খুব জোর গলায় বলতেন যে সমাজতন্ত্রের আওতায়, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটছে তাই উৎপাদনের উপকরণের জন্য কোন নিয়মিত বাজারের অস্তিত্ব থাকছে না। অতএব উৎপাদন ব্যয় ন্যায্য-ভাবে নির্ধারিত হতে পারছে না। কাজেই উৎপাদিত পণ্যের দামও চাহিদা-জোগানের সূত্রানুসারে ন্যায্যভাবে নির্ধারিত হচ্ছে না। বাজারের শাসনবহির্ভূত এই দামতন্ত্রের মধ্যে খানিকটা পরিমাণে স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ থাকছেই। এই স্ব-ইচ্ছাটা হতে পারে রাষ্ট্রের, হতে পারে রাজনৈতিক দলের, হতে পারে আমলাতন্ত্রের, হতে পারে কোনও একনায়কের। এই দামতন্ত্র কোনমতেই স্বাধীন মানুষের অবাধ ইচ্ছার প্রকাশ হতে পারে না। এঁদের চিন্তায় চাহিদা-জোগানের সূত্র থেকে বিচ্যুত হলেই দামের ন্যায্য নির্ধারণে আর পৌঁছনো সম্ভব হবে না। এঁদের মতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল খুঁত এইখানে।

বাজারতন্ত্রের প্রবক্তাদের এই চিন্তার অনেক জবাব দেওয়া যায়। যে-সব শর্ত পূরণ হলে চাহিদা-জোগানের খোলাবাজারে 'ন্যায্য' দাম নির্ধারিত হতে পারে, তার অনেক শর্তই অনেক সময়েই পূরণ হয় না। এটা গেল নাহয় তথ্যের স্তরের কথা। এবং তত্ত্বের স্তরে, বাজারের আওতায় নির্ধারিত দামের মধ্যে চাহিদা-জোগানের সমতা সাধিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য রকমের সামাজিক অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন, বন্টনের তীব্র অসাম্য। সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসের বদলে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জিনিসে যে বাজার ছেয়ে যায় সে তো চাহিদা-জোগানের 'ন্যায্য' সূত্র মেনেই। আমাদের নিজেদের দিকে তাকালেই এর অনেক উদাহরণ চোখে পড়বে। এই মুহূর্তেই বাজারে যত রকম গায়েমাখা সাবান আর কাপড়কাচার ডিটারজেন্ট পাউডার পাওয়া যাচ্ছে তার সবই কি সত্যিই খুব জরুরি? ওষুধের বাজারে যা চলছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় ওষুধের সংখ্যা মাত্র শ-দুয়েক, বর্তমানে আমাদের বাজারে চলে প্রায় ষাট হাজার। (এই তথ্যের জন্য আমি আমার ছাত্রী অধ্যাপিকা শ্রাবণী ঘোষের কাছে ঋণী।) সর্বোপরি, চাহিদা-জোগানের সমতাভিত্তিক ন্যায্য দামের জন্য যে ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী কাঠামোর অর্থনীতি অনিবার্য তাও নয়। বাজারতন্ত্রের প্রবক্তাদের উত্তরে অন্যার লাঙ্গে প্রমুখ অর্থ-নীতিবিদ এই মত পোষণ করতেন যে, কোনও একটা নির্ধারিত দাম থেকে শুরু করে চাহিদা-জোগানের ভিত্তিতে দামটাকে শুদ্ধ করতে করতে এমন একটা দামে পৌঁছনো সম্ভব যে-দামে চাহিদা ও জোগানের সমতা সম্ভব হবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী বাজারের দামতন্ত্রের 'ন্যায্য'তা পরিকল্পিত-ভাবেই আয়ত্ত করা সম্ভব। এর উত্তরে অবশ্য অন্যপক্ষের বক্তব্য ছিল অসংখ্য মানুষের চাহিদা ও জোগান হিসাব করে তার সমতা সাধন করে ন্যায্য দাম নির্ধারণ করা কাজটা তত্ত্বগতভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে অসাধ্য। পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবক্তারা এটা মানতেন না। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থনীতি ত একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু হচ্ছে। ঐ সময়ে বিভিন্ন পণ্যের একটা করে নির্দিষ্ট বাজার দাম ত আছে। সেখান থেকেই শুরু করা যেতে পারে। চাহিদা ও জোগান অনুসারে ঐ ঐতিহাসিক দাম কমিয়ে বা বাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে 'ন্যায্য' দামে পৌঁছনো যাবে। কাজেই লক্ষ সমীকরণ সমাধান করে তবে সাম্যাবস্থার দামে পৌঁছতে হবে বাস্তবে সমস্যাটা সেরকমভাবে দেখা দেবে না। তিরিশের দশকে এই টেকনিকাল বিতর্কে অংশগ্রহণকারী প্রধান তাত্ত্বিকেরা অনেকেই আজ আর জীবিত নেই। যাঁরা মনে করতেন যে টেকনিকাল কারণেই সমাজতন্ত্র সম্ভব নয় তাঁরা বেঁচে থাকলে আজ নিশ্চয়ই জয়ের তৃপ্তিলাভ করতেন। যদিও সে-তৃপ্তি সমুচিত হত কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকতেই পারে। সমাজতন্ত্র যদি সত্যিই টেকনিকাল কারণে ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে অন্তত ষাট বছর অপেক্ষা করতে হল কেন এ প্রশ্ন ত ওঠেই। পরিকল্পনার হিসাবপত্রজনিত টেকনিকাল সমস্যা ছিল না বা সে ব্যাপারে কোনও ভুলচুক হয় নি তা বলা হচ্ছে না। প্রশ্নটা এই: সত্যিই কি টেকনিকাল সমস্যার জন্য ঠেকে গেল, না কি আরও গুরুতর নীতিগত সমস্যা ছিল? সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-ও-সংস্কৃতির এক বিশেষ সমবায় কি এই ভাঙনের মূল কারণ নয়?

অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত পরিকল্পনার ভারি শিল্প গড়ে তোলার দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত বিশের দশকে শিল্পায়নের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদ বিতর্কের মধ্য দিয়ে শিল্পনীতি রচিত হয়েছিল। এই পর্বের বিচার বিতর্কের মধ্যে এমন অনেক প্রসঙ্গ ছিল যার ফলাফল ছিল সত্যিই সুদূরপ্রসারী। সাবেক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিপর্যয়ের দিকে ফিরে তাকাতে গেলে

এসব প্রসঙ্গের ভেতরে ঢুকে অনেক কিছুই পুনর্বিবেচনার অবকাশ আছে। এই ভারি শিল্পবিকাশের নীতি নিয়েই অনেক রকমের দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব। এই প্রসঙ্গটা আমাদের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম প্রাসঙ্গিক। ভারি শিল্প বিকাশের বিরুদ্ধ হিসাবে কিছুকিছু বিবাদী সুর আমাদের এখানে আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু অন্ত কোলাহলে সে কণ্ঠস্বর অশ্রুতপ্রায়। বিশের দশকে সোভিয়েতে শিল্পায়নের নানা দিক নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা ছিল। ১৯২৫-২৬ সালটাকে অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্পায়নের দিক থেকে বিশেষ দিকচিহ্ন হিসেবে ধরা যায়। ঐ বছরেই শিল্পোৎপাদন মোটামুটি যুদ্ধ-পূর্ব স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল বলে ধরা হয়। আর কৃষিতে, আবাদী জমির পরিমাণ ও কৃষি উৎপাদন ছিল মোটামুটিভাবে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের প্রায় নয়-দশমাংশ। খাদ্যশস্যে কিছুটা কম। ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণোদ্যম শিল্পায়নকেই ভবিষ্যতের প্রধান পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হল। এক হিসেবে দেশকে শিল্পোন্নত করার তখন খুবই দরকার ছিল। সামগ্রিকভাবে শিল্পোৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব স্তরে পৌঁছে গেলেও বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯২৫-২৬-এ ছিল মাত্র ৬০ শতাংশ। যে-কোনও আধুনিক শিল্পোন্নয়নে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব বিচার করলে ভারি শিল্পের দিকে যে নজর দেওয়া প্রয়োজন ছিল তাতে হয়ত কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পায়ন বিতর্কের মধ্যে খুব জরুরি অনেকগুলো সমস্যা মিলেমিশে ছিল। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, এমন একটা দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যেখানে আধুনিক শিল্পের রূচনা দেখা দিলেও শিল্পের বুনিয়াদ দুর্বল ও কৃষি অনুন্নত। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আদৌ অনুকূল নয়। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় শিল্পে অগ্রসর দেশগুলোতে কোনও বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তেমন করে নেই, অন্তত কাঠামোগত সমাজ রূপান্তরের সেখানে কোনও আশু সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় ত্রট্‌স্কি এবং আরও কেউ কেউ ত প্রশ্ন তুলেছিলেন যে দ্বীপের মত বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একলা একটা দেশে একক প্রচেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব কি না। অন্তত পশ্চিম ইউরোপকে এই সমাজ রূপান্তর ত্বরান্বিত করা আশু কর্তব্য কি না। দ্রুত শিল্পায়ন যদি লক্ষ্য হয় তাহলে তার প্রয়োজনীয় প্রাক্‌সঞ্চয় সংগ্রহ হবে কোথা থেকে? কৃষি ত অনুন্নত। কৃষির থেকে উপাদান বেশি মাত্রায় কি শিল্পে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে? তা যদি করতে হয় তাহলে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? রাষ্ট্র কি শুধু শ্রমিক শ্রেণীর? কৃষক জোট শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়াবে কীভাবে? সোভিয়েত সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের অধীনে পরিকল্পিত অর্থনীতির আওতায় এই সবগুলোই ছিল খুব জরুরি। এসব প্রশ্নের উত্তর নীতি-নির্ধারণের দিক থেকে ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশের দশকের সোভিয়েত শিল্পায়ন বিতর্ক এমনই জটিল একটা বিষয় যে বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে তার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব না। বহু রকমের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ জড়িয়ে এই বিতর্কের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এত নানারকমের মতামত ছিল যে এই বিতর্কের কোনও ছিমছাম সারসংক্ষেপ করাও বেশ শক্ত কাজ। এই বিতর্কের প্রসঙ্গেই প্রেওব্রাঝেন্স্কি ও বুখারিনের ভিন্ন অবস্থান সোভিয়েত শিল্পায়নের ভিন্ন ভিন্ন দিক নির্দেশ করে। কিথ স্মিথ তাঁর 'ইকোনমিক থিয়োরি অ্যাণ্ড দ্য সোভিয়েট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ডিবেট' (**সোভিয়েট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যাণ্ড সোভিয়েট ম্যাচিওরিটি**, ইকোনমি অ্যাণ্ড সোসাইটি সিরিজ, লণ্ডন, ১৯৮৬) প্রবন্ধে এই বিতর্কের অন্তর্গত মূল প্রসঙ্গগুলির একটা তালিকা প্রণয়ন করেছেন। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের প্রচেষ্টায় যে সব সমস্যা তখন প্রধান বলে মনে হয়েছিল তার প্রায় সবই এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। সমাজতন্ত্র নির্মাণে তখনকার চিন্তায় রাষ্ট্রের জন্য প্রধান ভূমিকা খুব নিশ্চিত-ভাবেই চিহ্নিত করা ছিল। রাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে সমবায়ী ক্ষেত্রের কথাও অবশ্য কল্পনা করা হয়েছিল, বিশেষত কৃষিতে। শিল্পোন্নয়ন মূলত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। তাই প্রশ্ন অর্থনীতির মোট উপাদানের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও অধিকার কীভাবে ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হবে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের হার কী হবে? অর্থনীতির বৃদ্ধির হার কী হবে? কৃষিক্ষেত্রে কুলাক শ্রেণী, অর্থাৎ ধনী কৃষক শ্রেণী বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের প্রসঙ্গে খুব জরুরি প্রশ্ন ছিল। এই কুলাক শ্রেণীর কাছ থেকেই সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও শিল্পের জন্য উপাদান সংগ্রহ প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কিন্তু কুলাক শ্রেণী যথোপযুক্ত পুষ্টি পেলে কি কালক্রমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিতটাকেই দুর্বল করে দেবে না? এই প্রসঙ্গে তখনকার সোভিয়েত সমাজ-অর্থনীতিতে 'স্মিচ্‌কা'-র প্রশ্নও খুব জরুরি ছিল। এই রুশ শব্দটির অর্থ শ্রমিক-কৃষক ঐক্য ও সেই ঐক্যের ভিত্তিতে

গড়ে ওঠা এক সামাজিক জোট। এই রকম এক সামাজিক জোট নতুন এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতি ও তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু কৃষিকে যদি খুব বেশি চাপ দিয়ে শিল্পের জন্য সম্পদ সংগ্রহের প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে স্থিতাবস্থা ব্যাহত হতে বাধ্য। সোভিয়েত শিল্পায়নের প্রকৃত অভিজ্ঞতায় শ্রমিক-কৃষক ঐক্য খানিকটা ত ব্যাহত হয়েছিল বটেই। প্রশ্নগুলো সবই ছিল খুব জটিল, বহু বিচিত্র মাত্রায় এক একটা সমস্যা অন্য সব সমস্যার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে কোনও প্রশ্নেরই কোনও সরল উত্তর সম্ভব ছিল না।

এই সব বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান বিচার করে কিথ স্মিথ মোটামুটি চারটি অবস্থান নির্ণয় করেছেন: ওঁর ভাষায় বলতে গেলে, প্রথম একটা হল একটু রক্ষণশীল অবস্থান, এর প্রবক্তা স্টেট ব্যাংক ও নারকম্‌ফিন, অর্থাৎ অর্থ অধিকর্তা। দ্বিতীয় অবস্থানের প্রধান প্রবক্তা প্রেওব্রাঝেন্স্কি, এটাকে বলা যেতে পারে তখনকার পরিস্থিতিতে বামপন্থী অবস্থান। তৃতীয় হল বুখারিন ও পলিট্‌ব্যুরোর বৃহদংশের অবস্থান। চতুর্থ অবস্থানের প্রবক্তা স্বয়ং স্তালিন ও সরকারি পরিকল্পনা কমিশন, গস্‌প্লান এবং সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংসদ, ভেশেঙ্কা। অবস্থানগুলোও একটা পরিষ্কার কিছু না। মিলে গরমিলে বেশ জটিল বুনট। সোভিয়েত শিল্পায়নের প্রকৃত অভিজ্ঞতায় কোন্ অবস্থান কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল বা কোন্ মত ঠিক কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সে অঙ্ক গবেষণার বিষয় এবং সে গবেষণায় প্রকৃত তথ্য কতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব তা বলা খুবই শক্ত। তবে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিকাশ পদ্ধতি সম্বন্ধে দুটো একটা সাধারণ কথা নিয়ে একটু জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে।

বিশের দশকের তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে এবং তিরিশের দশকের শিল্পায়ন প্রচেষ্টার পথে সোভিয়েত সমাজ ও অর্থনীতির কিছু ঝোঁক মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। মনে রাখা দরকার যে, মার্কসের তত্ত্বকাঠামো থেকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য খুব স্পষ্ট কর্মসূচি বেশি কিছু পাওয়া যায় নি এবং তা পাবার কথাও ছিল না। মার্কসের তত্ত্বকাঠামোর প্রধান অংশটা ছিল তাঁর সময় পর্যন্ত বিকশিত ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিকাশের এক সর্বাঙ্গীণ সমালোচন। সে সমালোচন হয়ত সব অংশের ক্ষেত্রে সমানভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে নি, মার্কসের অনেক তাত্ত্বিক কাজই অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এই সমালোচনের অন্তর্ভুক্ত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত অঙ্গ। সমালোচনের এই সর্বাঙ্গীণ ধরনটা খুবই লক্ষণীয়; বিশেষত মার্কসের জীবৎকালের সমসাময়িক প্রাক্তিক অর্থনীতির বিকাশ-প্রক্রিয়ার কথা মনে রাখলে মার্কসের পদ্ধতিগত তাৎপর্য আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। মার্কস ত তাঁর ১৮৪৪-এ লেখা **'প্যারী পাণ্ডুলিপি'**-তেই পুঁজিবাদী সম্পদ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত শ্রমের বিযুক্তির প্রশ্ন তুলে-ছিলেন। বস্তুত, তাঁর কাছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান আপত্তিজনক বিষয় বলে ত এটাই মনে হয়েছিল যে, শ্রমিক তার কাজের উপকরণের থেকে বিযুক্ত, এবং ফলে সে তার শ্রমের পরিণাম থেকেও বিযুক্ত। শ্রমিকের সফল শ্রম-প্রক্রিয়ার পণ্য পরিণামে তার কোনও বাড়তি অধিকার নেই। তার নিজের শ্রমের পরিণতি যে পুঁজিবাদী পণ্য তার বেলাতেও সে আর পাঁচজনের মতই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, সেই অর্থে সে বিযুক্ত; আর পাঁচজনের মতই বাজার সম্পর্কের মধ্যে নিজের উৎপাদিত পণ্যের ওপর যতটুকু অধিকার কায়েম করা সম্ভব মাত্র ততটুকুতেই তার অধিকার। পুঁজিবাদী সমাজের এই যে দৃশ্যপট মার্কস তা হাজার কয়েক পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি রচনা করে তাকেই ভেঙে ভেঙে বুঝতে চেয়েছেন। তার থেকে পরিত্রাণের সহজ কোন নিদান ত বাতলান নি তিনি। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কোনও রাজপথ নির্দেশ করে যান নি। ওটা ছিল পরবর্তীদের করণীয় কাজ। অথচ এই বিশের দশকের বিতর্কে মার্কসের অনেক পদ্ধতি ও প্রত্যয়কে এমনভাবে ব্যবহার করা হল যেন মার্কস রচনাবলিতে সমাজতন্ত্রের কোন ম্যানুয়াল প্রত্যাশিত ছিল। পুঁজিবাদী বিনিময় চক্রের বিশ্লেষণে মার্কস যখন গোটা অর্থনীতিকে মাত্র দুটো বিভাগে ভাগ করে নিয়ে এরকম একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেন যার থেকে আমরা বুঝতে পারি কীভাবে দুটো বিভাগের মধ্যে নির্বিঘ্নে বিনিময় হতে পারে তখন আমরা নিশ্চয়ই আশা করি না যে এক প্রকৃত অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার থেকে এক ছিমছাম পরিকল্পনার নীতি নিকাশন করা সম্ভব হবে। প্রেওব্রাঝেন্স্কি মার্কসের 'পুনরুৎপাদন ছক'-এর আদলে যখন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নির্মাণে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা করেন বা তাঁর সামাবস্থার ধারণা ও আদিম সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের ধারণাগুলোর প্রয়োগ করেন তখন মনে হয় এ ব্যাপারগুলোকে বড় বেশি যান্ত্রিকভাবে দেখা হচ্ছিল। প্রেওব্রাঝেন্স্কি নামটা এখানে

নিতান্ত একটা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হল, এ রকম যান্ত্রিকতার উদাহরণ অন্যত্রও পাওয়া যাবে। এমন কি এই যান্ত্রিকতা যে শুধুমাত্র মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাও নয়, অনেক ধারণার বেলাতেই তা প্রান্তিকতাবাদী অর্থনীতি ও তথাকথিত পশ্চিমী চিন্তার আদল পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল। তিরিশের দশকের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে সমাজ-তন্ত্র, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পায়ন, দ্রুত শিল্পায়ন, ভারি শিল্পের দ্রুত বিকাশ ইত্যাদি ধারণাগুলো ত মিলে মিশে গেল। এই সময় থেকেই অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ঝোঁক একেবারে প্রকট হয়ে উঠল। এর আগের পর্বে বিকেন্দ্রী-কৃত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের একটা ধারা কিন্তু গড়ে উঠছিল। গৃহযুদ্ধের পর্বের 'ওঅর কম্যুনিজম' থেকে নতুন অর্থনৈতিক জমানায় (নেপ) উত্তরণের কালে খানিকটা পরিমাণে স্বনিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলবার একটা প্রবণতা কিন্তু ছিল। বিভিন্ন আকারের ট্রাস্ট-এর ভিত্তিতে গড়ে তোলা এই ব্যবস্থাকে বলা হত খোজ্‌রাশ্‌চত্‌। খোজ্‌রাশ্‌চত্‌ ব্যবস্থায় শিল্প উদ্যমগুলিকে তাদের নিজেদের হিসাবপত্রের পুরো দায়িত্ব নিজেদের নিতে হত, তাদের আয়-ব্যয়ের মধ্যেকার সমতা রক্ষা করার পুরো দায়িত্বভার তাদের নিজেদের। শুধুমাত্র রাষ্ট্রের প্রতি তাদের একটা নির্দিষ্ট দেয় থাকত। তাদের লভ্যাংশের কিছুটা রাষ্ট্রকে দিয়ে দেবার পরে ব্যাকিটা নিজেদের হাতে থাকত উদ্যমের প্রসার চিন্তার ও নতুন নতুন উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য। শিল্পোদ্যমের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পরিসম্পৎ রাষ্ট্রের সম্পত্তি, উদ্যমের পরিচালন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। খুব মোটা দাগে কিছু কিছু নির্দেশনামা দেওয়া থাকত এইসব উদ্যম-গুলির হাতে, তার মধ্যে ছোট বড় অনেক সিদ্ধান্তের দায়িত্ব এদের নিজেদের। কী উৎপাদিত হবে, কতটুকু, কোথায় বিক্রি হবে, কীভাবে এসব সিদ্ধান্ত শিল্পোদ্যমের নিজের, সেই অর্থে অনেকটাই স্বশাসিত। বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ মানেই যে বেসরকারি পুঁজির অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। এ দুটো আলাদা নীতির আদল। বেসরকারি পুঁজিকে কতটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হবে না হবে সেটা আলাদা সিদ্ধান্ত।

এই খোজ্‌রাশ্‌চত্‌ ব্যবস্থা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একেবারে প্রায় গোড়া পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অন্যতম সুহৃদ অন্যতম শ্রদ্ধেয় পশ্চিমী পণ্ডিত মরিস ডব্‌ বেশ জোর দিয়েই বলছেন যে পরিকল্পনা যত এগোতে থাকল তিরিশের দশকে ততই উত্তরোত্তর কেন্দ্রি-কতার ঝোঁক বাড়তে থাকল। ওঁর ভাষায়:

> Much use was made at the time of a distinction, in priciple, between "general direction and control (steering)", which was the province of the higher bodies, and "detailed operation and execution" of industrial policy and of general objectives; this latter function belonging to industrial enterprises and their managements on the basis of the above-mentioned *Khozraschot*. (*Socialist Planning*, Lawrence & Wishart, London 1970, পৃ. ১৩)

এবং

> ...The tide was to turn in the direction of greater centralisation—slowly at first, but then with gathering pace as the decade of the '30s advanced, and the Second Five Year Plan followed on the heels of the First and after it the (unfinished) Third. (ঐ)

অর্থনীতিতে ও পরিকল্পনায় এই কেন্দ্রিকতার ঝোঁক যত বাড়তে থাকল রাষ্ট্রও ক্রমশ তত সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল। গোটা সমাজকাঠামো হয়ে উঠল কেন্দ্রাভিমুখী। এই মুহূর্ত থেকে ধারণাগত ভাবেও রাষ্ট্রিকতা আর সমাজতান্ত্রিকতা একাকার হয়ে উঠল। ভারি শিল্পের বিকাশ, দ্রুত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বুদ্ধির হার দ্রুততম করা, নতুন প্রযুক্তির বিকাশ, পশ্চিমী অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া এইসব লক্ষ্যে নিবদ্ধ সোভিয়েত সমাজ ক্রমশ পশ্চিমী আদলেরই রকমকের হয়ে দেখা দিল। আলগাভাবে নিলে হঠাৎ এই কথাটায় খুব খটকা লাগবে। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে যে এই পর্বে সমাজবিকাশের রাস্তা বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে মূলত গ্রহণ করা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিকে। এই আদলটা মূলত ইউরোপীয় রেনেসাঁস-উত্তর আঠারো শতকী 'প্রগতিমুখী' বিকাশের আদল। এই আদলে প্রযুক্তিই মানববিকাশে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই আদলই প্রায় অনিবার্যভাবে পারমাণবিক প্রযুক্তির পথ খুলে দেবে। সেখানে পুঁজিবাদ

ও এই আদলের সমাজতন্ত্র দুইই সমান সমান লড়াইয়ের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী। এই পাল্লাকষার খেলায় মেতে গেলে ঐ পশ্চিমী আদলের জালেই জড়িয়ে যেতে হয়। তার সঙ্গে দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তিরিশের দশক শেষ না হতেই অপরিণত অর্থনীতি নিয়েই চল্লিশের দশকে সোভিয়েতকে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হল। সোভিয়েতের বর্তমান সংকটের প্রসঙ্গে অনেককেই এরকম একটা আক্ষেপ করতে শোনা যায় যে, যে সোভিয়েত একদিন নাৎসিবাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে ছিল, যে সোভিয়েত মহাকাশ যাত্রা করেছিল, যে সোভিয়েত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথে অতদূর অগ্রগতি দেখাতে পেরেছিল সেই সোভিয়েতে কী এমন হল যে কাঠামোটা ওরকম হুড়মুড় করে ভেঙে গেল। তাঁরা এই মনোভঙ্গি থেকে এক ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের শিকার হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাববার চেষ্টা করেন সাম্রাজ্যবাদের কোন চর কখন কোন বিশ্বাসঘাতকতা করায় এই বিপর্যয় দেখা দিল। তাঁরা খুঁজে পেতে চান আসল দুশমন কে—লিওনিদ্ ব্রেজ্‌নেভ্ না মিখাইল গরবাচভ্ না বরিস ইয়েলৎসিন না কি একেবারে নিকিতা খ্রুশ্চভ্? এঁদের কারও কোনও বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না বা তার কোনও অবকাশ ছিল না তা মোটেই বলা হচ্ছে না। এখানে যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি তা এই যে, যে-বিকাশ প্রক্রিয়াকে একদিন সোভিয়েততন্ত্রের সাফল্যের মাপকাঠি বলে মনে হয়েছিল সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ভবিষ্যতের সংকটের বীজ সম্ভবত নিহিত ছিল। পুঁজিবাদের বিকল্প বিন্যাস হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গড়ে তোলার মুহূর্তে বিকল্পটা কত দূরে নিয়ে গিয়ে বিন্যস্ত করা দরকার সেই বোধটা সম্ভবত খুব পরিষ্কার ছিল না। হয়ত সেই মুহূর্তে খুব পরিষ্কার থাকা স্বাভাবিক ছিল না। হয়ত ওঠা পড়ার এই ইতিহাসের মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগোবে এটা মেনে নেওয়াই সংগত। মার্কসের পুঁজিবাদ সমালোচনায় বিযুক্তির প্রসঙ্গটাকে যদি জরুরি বলে মনে করা হয় তাহলে ত সাবধান থাকতেই হয় যাতে পুঁজিবাদী বিযুক্তির বদলে আবার আর এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক বিযুক্তি এসে আমাদের গ্রাস না করে। কেন্দ্রাভিমুখী অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায়, প্রায় সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের আধিপত্যে, পার্টিগ্রস্ত রাজনীতির দাপটে অসহায় সাধারণ নাগরিকের তরফে বিযুক্তি ক্রমে ক্রমে এক গভীর সংকটময় চেহারা নিয়ে দেখা দিল। আপাতত দুর্নীতি ইত্যাদি বিচ্যুতির ওপরে আমি তেমন জোর দিচ্ছি না। এসব বিচ্যুতি ত ছিলই, কিন্তু তা বাদ দিয়েও সব কিছু বোধ হয় ঠিকঠাক ছিল না। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের স্পিচ্‌কা তেমন শক্ত জমিতে দাঁড়াতে পারে নি, ভারি শিল্প ভিত্তিক প্রযুক্তিও বৃহদায়তন আধুনিক প্রযুক্তির পরিকাঠামো ক্রমে ক্রমে ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন সংকট সৃষ্টি করল যে সাধারণ নাগরিক তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় ঠিক তেমন উল্লাসের কোনও কারণ খুঁজে পেল না। খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যের মত মৌল প্রয়োজনের বেলায় সমাজতন্ত্র যেটুকু সুরাহা করতে পেরেছিল তার গুরুত্ব সাধারণ নাগরিকের বোধে দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে এল। পশ্চিমের অবাস্তর ভোগ্যপণ্যময় জীবনের হাতছানি দুর্বার হয়ে দেখা দিল। এই আঘাত ঠেকাতে যে-সাংস্কৃতিক পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল তাও গড়ে তোলবার দিকে মন দেওয়া হয় নি। ফলে বিকল্প বিন্যাসের বিশ্বাসযোগ্যতাই আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল।

এই রকমের পটভূমিতে পঞ্চাশের দশকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জড়িয়ে যেতে হল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত যথেষ্ট শক্ত নয়, রাষ্ট্রকাঠামো থেকে সাধারণ মানুষ এক গভীর অর্থে স্খলিত, প্রযুক্তির পরিকাঠামোকে প্রয়োজনেও আর হালকা শিল্প বা ভোগ্যদ্রব্যমুখী করে তোলা কঠিন এই রকম একটা পরিস্থিতিতে পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দিতে হল স্নায়ুযুদ্ধে। এর অনিবার্য পরিণতি পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার মজুত করা। এই অসম্ভবের খেলায় পশ্চিমের পুঁজিবাদী কাঠামোকেই অবসন্ন হয়ে পড়তে হল, সোভিয়েত তন্ত্রের অবস্থা যে আরও কাহিল হবে তাতে আর বিস্ময়ের কী। একথা সুবিদিত যে এই স্নায়ুযুদ্ধের পরিণামে, এবং ভিয়েতনামের আগ্রাসী যুদ্ধের খরচ সামলাতে গিয়ে মার্কিন অর্থনীতিরও নাভিশ্বাস উঠেছিল। পৃথিবীর বৃহৎ অধমর্ণ এই দেশ তার টালমাটাল অর্থনীতি নিয়ে এখনও হিমশিম খাচ্ছে। বিকল্প বিন্যাসের সন্ধানে বেরিয়েও মূলত ঐ একই বিন্যাসের অন্তর্গত হয়ে গিয়ে সোভিয়েততন্ত্র যে তার সারূপ্যও আজ আর বজায় রাখতে পারল না এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু আছে। সমাজতন্ত্রের বিন্যাস সত্যিকারের বিকল্প বিন্যাস হয়ে ওঠা দরকার। সমাজ সংগঠনের যুক্তিন্যায় যতক্ষণ পর্যন্ত মূলত একই বৃত্তে স্থাপিত ততক্ষণ ত সেই বিকল্পের দেখা মিলবে না। তাই আরও অন্য সন্ধানের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

অন্য সন্ধানের কিছু কিছু প্রচেষ্টা পঞ্চাশের দশক থেকেই একটু একটু লক্ষ করা যায়। ষাটের দশক থেকে অর্থনীতিতে সংস্কার প্রচেষ্টাকে ত রীতিমত বেশ বিস্তারিত করবার

চেষ্টাই চলছিল। এইসব সংস্কারের মধ্যে একটা বড় দিক ছিল শিল্পোদ্যমের শ্রমিক ও পরিচালকের জন্য উপযুক্ত উৎসাহের ব্যবস্থা করা। ঐ যে সমাজতান্ত্রিক বিযুক্তির প্রসঙ্গ তুলেছিলাম খানিকটা বোধ হয় তারই শুদ্ধিব্যবস্থা হিসেবে কিছু বস্তুগত উৎসাহের কথা চিন্তা করা হল। সাংস্কৃতিক পরিখা নির্মাণ করা যায় নি, সাধারণ নাগরিককে সচেতন সমাজতান্ত্রিক সৈনিকে রূপান্তরিত করা যায় নি, সমাজতন্ত্রের জন্য অন্য মানুষের দেখা মেলে নি। এই রকম অবস্থায় যা কিছু ঘাটতি তা কিছু বস্তুগত উৎসাহের ব্যবস্থা করে পূরণ করবার চেষ্টা করা হল। ১৯৩৬ থেকেই শিল্পোদ্যমের নিজস্ব একটা অর্থভাণ্ডার তৈরি করবার পরিকল্পনা ছিল। এই উৎসাহ সঞ্চার করবার প্রয়োজনীয়তা তখন থেকেই উপলব্ধি করা হয়েছিল। প্রথম দিকে এটাকে বলা হত শিল্পোদ্যমের পরিচালকের ভাণ্ডার, যুদ্ধের পরে এটাকে শিল্পোদ্যমের ভাণ্ডার হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। পরিকল্পনা-নির্ধারিত লাভের থেকে বেশি লাভ উপার্জন করতে পারলে তার থেকে এই ভাণ্ডার গড়ে তোলার কথা। এই ভাণ্ডার থেকে শিল্পোদ্যমের কর্মীদের জন্য, বাড়ি বানোনোর খরচ ও অন্যান্য কল্যাণমূলক খরচ ও কর্মীদের বোনাসের খরচ ইত্যাদি মেটাবার কথা। কী কী খাতে এই খরচ করা যাবে তার একটা অনুমোদিত তালিকাও ছিল। এই খরচ খরচার দায়িত্ব ছিল শিল্পোদ্যমের পরিচালকের, তবে কর্মীসংঘের অন্তর্গত ফ্যাক্টরি কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে এই খরচ করতে হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থাও তেমন কিছু দাঁড়ায় নি। ভাণ্ডারে কত পরিমাণ জমা দেওয়া চলবে তার একটা ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া ছিল। তা ছাড়া আদৌ জমা দিতে গেলে শিল্পোদ্যমের ওপর পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা যা নির্দিষ্ট আছে তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করে, বেশি লাভ করে তবে তা জমা দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব হচ্ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাণ্ডার থেকে উদ্যমের বিনিয়োগের জন্যও খরচ করা হচ্ছিল। এতে করে উৎসাহ দানের চরিত্রে ব্যাঘাত ঘটছিল। কালক্রমে আরও অন্যান্য ধরনের কিছু বোনাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ফলে এই 'উৎসাহ-ভাণ্ডার' খানিকটা অকেজো হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে পরিকল্পনা-নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবার জন্যই বাড়তি বোনাসের ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল। আমাদের পরিস্থিতিতে যেমন নির্ধারিত কাজ করবার জন্য ওভারটাইমের ব্যবস্থা করতে হয় খানিকটা সেই ধরনের আর কী। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাতেও আমরা বুঝতে পারি যে গোটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পদ্ধতিটাই ক্রমশ গোলমাল হয়ে যেতে বসল। এই জায়গায় পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত একটা টেক্‌নিকাল সমস্যা খুব বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। পরিকল্পনার যে-নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে তার নির্দেশ দেওয়া হবে কোন এককে? দৈর্ঘ্যে না ওজনে না গুনতিতে? একটা বিখ্যাত কার্টুন আছে যে লোহার একটা বিরাট পেরেক বয়ে নিয়ে চলেছে ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা। নিচে লেখা: পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ। ঐ পেরেকটা কারও কোনও কাজে লাগবে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন।

হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। নির্দেশনামাভিত্তিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যমাত্রার নির্দেশ বেশ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটা যদি মূলত হিতবাদী দৃষ্টিকোণ প্রভাবিত হয় তাহলে বিযুক্ত ব্যক্তির বা শিল্পোদ্যমের ক্ষেত্রে কোনও নির্দেশই এমন কোনভাবে দেওয়া খুবই শক্ত যেখানে নির্দেশ পালন করেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেওয়া না যায়। কাজের পরিমাণের হিসেবে নির্দেশ দিলে উৎপাদনের গুণগত মান বজায় রাখা দায় হয়, মূল্যের হিসেবে নির্দেশ দিলে ঝোঁক হবে বেশি মূল্যের জিনিস উৎপাদন করার। এতে প্রকৃত সম্পদ ও উৎপাদকের উপকরণের অপচয় ঠেকানো শক্ত হয়। সোভিয়েত পরিকল্পনায় একটা পর্বে এ অভিজ্ঞতাও অর্জন করা গেছে। এতে করে বহুল ব্যবহারের সামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে, ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর প্রত্যেকটার উদাহরণ পাওয়া যাবে সোভিয়েত পরিকল্পনার ইতিহাসে। সমাজতন্ত্রের আওতায় বিযুক্তির সমস্যা যতক্ষণ পর্যন্ত পেরিয়ে যাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ নির্দেশনামা রচনার এ টেকনিকাল সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। নির্দেশনামাভিত্তিক অর্থনীতির থেকে সরে আসতে গেলে বিকেন্দ্রীকরণের পথে যেতে হয়। খ্রুশ্চভের আমল থেকেই এদিকে একটু আধটু চেষ্টা করা হচ্ছিল। ১৯৫৭তেই কিছুটা আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা হয়েছিল। বড় বড় মন্ত্রণা বিভাগগুলিকে ভেঙে ছোট ছোট আঞ্চলিক পরিষদে ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিছুটা পরিমাণে বণ্টন করা হয়েছিল। কিন্তু এতে করে প্রকৃত সুরাহা বিশেষ কিছু হয়নি। আমলাতান্ত্রিক চাপ খুব বড় রকমের কিছু আলগা করা যায় নি। প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধাও বেশি লাভ করা সম্ভব হয়নি।

সংস্কার প্রচেষ্টার এই চিন্তাধারাকে ষাটের দশকে আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ১৯৬৫-তে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রচেষ্টা বেশ কিছুটা সংবদ্ধ রূপ পেল। এই পর্বের প্রধান তাত্ত্বিক অধ্যাপক লিবেরমান। লিবেরমানের চিন্তায় বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার ওপরে খুব জোর দেওয়া হল। শিল্পোদ্যমের জন্য রচিত পরিকল্পনায় খুব মোটামুটি ধরনের কিছু নির্দেশক থাকবে, কিন্তু বিস্তারিত অনুপুঙ্খ রচনার বা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব উদ্যমের স্তরেই ছেড়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। সবটা অত ওপর থেকে চাপিয়ে দেবার দরকার নেই। এবং উদ্যমের স্তরে সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় উৎপাদনের সম্ভাব্য ভোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগা-যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদনকে প্রয়োজনমুখী করে তোলাও সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকে যত নজর থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রয়োজন বা ব্যবহারের দিকে তত নাও থাকতে পারে। এ অবস্থা ত আসলে অপচয়। লিবেরমান সংস্কারে এ অপচয় রোধ করবার চিন্তা খুব স্বাভাবিক ছিল। বাজারের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদন সিদ্ধান্তকে খানিকটা অন্বিত করতে পারলে সে সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়ত সম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাজারমুখী অর্থনীতির অন্যান্য অবাঞ্ছিত কিছু কিছু লক্ষণ যে আবার দেখা দিতে পারে সে সম্ভাবনাও থেকে যায়। এই পর্বে এরকম লক্ষণ কিছু কিছু দেখা দিয়েছিল।

শুধু সোভিয়েতে নয়, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অন্য দেশেও অনুরূপ সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। মধ্য ষাটের সংস্কার পর্ব থেকে চেকোস্লোভাকিয়াতে আস্তে আস্তে দেখা দিল দুব্‌চেক্‌ রাজনীতি ও 'প্রাহা বসন্ত'। ঐ বসন্তের খোলা হাওয়ার ঝোঁক যে শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দমন করতে হল এতে করে সমাজতান্ত্রিক বিযুক্তি আর একটা অন্য স্তরে পৌঁছে গেল। যা ছিল বিযুক্ত বা স্খলিত এবং সেই অর্থে খানিকটা নিষ্ক্রিয়, তা আস্তে আস্তে অনেক বেশি সক্রিয় ও সরব হয়ে উঠল এবং ক্রমে ক্রমে বিক্ষোভ ও প্রায় বিদ্রোহের রূপ ধারণ করল। রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোয় গণতন্ত্রের দাবি এই সময় থেকেই এমন চেহারা নিল যে তা আর চিরকালের মত ঠেকিয়ে রাখা শক্ত ছিল। এরই পরিপূরক চিন্তা ছিল অর্থনীতিতে খোলা বাজারের বিকাশ। এক ধরনের 'বাজার-সমাজতন্ত্র'-এর ধারণা এই সময় থেকে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। এই পর্বে ভোগ্যপণ্যের অভাব ও তার নিকৃষ্ট গুণগত মান সমাজতন্ত্রের বাসিন্দাদের কাছে সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদের চেয়ে অনেক ছোট করে দিল। তার আর বড়াই করার যেন কিছু রইল না। মূলত সহধর্মী প্রযুক্তির পথে পুঁজিবাদের সঙ্গে মূলত একই লড়াই লড়তে গিয়ে, মূলত একই শর্তে বৃহৎ শক্তি হিসেবে বলীয়ান হতে গিয়ে পরিণামে সমাজতন্ত্রকে পিছু হঠতে হল। সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্র-সমাজ ও রাজ-নীতিতে ঠিক কবে থেকে বিচ্যুতি শুরু হয়েছিল প্রশ্নটাকে এভাবে না তোলাই ভাল। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ধারা-ভাষ্যে এ কথাটা বোঝবার চেষ্টা করছি যে বিশ শতকের ইতিহাসে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলবার এই প্রক্রিয়া কীভাবে প্রকৃত কোনও বিকল্প মুহূর্ত ছুঁতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। বিকল্প বিন্যাসটাকে যে-বৃত্তে রচনা করার চেষ্টা হয়েছিল তা বোধ হয় বড় সংকীর্ণ। নতুন চেষ্টায় বিকল্প বৃত্তকে হয়ত আরও প্রসারিত করে দেখতে হবে।

এর পরেই সেই অন্তিম পর্বের শুরু। মিখাইল গরবাচভের জমানায় গৃহীত পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্ত নীতি। পেরেস্ত্রৈকার অর্থ পুনর্গঠন আর গ্লাসনস্ত মানে মুক্তদ্বার খোলামেলা আবহাওয়া। পেরেস্ত্রৈকার আওতায় অর্থনীতি ও প্রশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন করে বিন্যস্ত করার চিন্তা করা হল। আর গ্লাসনস্তের উদ্দেশ্য কিছুটা পরিমাণে গণতান্ত্রিকতাকে স্বীকৃতি জানানো, সমালোচনার অধিকারকে খানিকটা অন্তত মেনে নেওয়া। অনেকে মনে করেন গরবাচভের এই নীতির ফলেই সব কিছু ধ্বসে গেল। এটা সরলীকরণ। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে গরবাচভ তাঁর পশ্চিম-লালিত চিন্তায় এসব নীতির দিকে ঝুঁকেছিলেন তাহলেও বস্তুগত অর্থে দেশ ও দেশের অর্থনীতিকে তিনি কী অবস্থায় পেয়েছিলেন সে কথা মনে রাখতেই হবে। গরবাচভ্‌কে যে-সুতো ছাড়তে হয়েছিল তা কতটা অনিবার্য ছিল এ বিচার বাদ দিলে চলবে না। যে-সংস্কারের চাপ জমে উঠছিল তা কি আর প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল?

ষাটের দশকের সংস্কারপর্বের প্রধান তাত্ত্বিক যেমন লিবেরমান, পেরেস্ত্রৈকা পর্বের প্রধান তত্ত্বদর্শী তেমনি আবেল আগানবেগিয়ান। পেরেস্ত্রৈকার অর্থনৈতিক দর্শনের তিনিই প্রধান স্থপতি। তাঁর চিন্তাভাবনার বিশদ বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু ধরনটা সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে। গরবাচভ্‌ যখন তাঁর পেরেস্ত্রৈকা অভিযান শুরু করছিলেন, ১৯৮৭-তে সোভিয়েত বিপ্লবের সত্তরতম জয়ন্তী পালনের পর্বে তাঁর বিখ্যাত 'অক্টোবর ও পেরেস্ত্রৈকা: বিপ্লব

চলছে' শীর্ষক বক্তৃতায়ও তিনি কিন্তু লেনিনের সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথাই তুলে ধরছেন। পেরেস্ত্রৈকা পর্ব সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার একটা ধাপ, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাপ। গরবাচভের বক্তৃতার মর্মে ছিল এসব কথা। কিন্তু আগানবেগিয়ান কী রকম ভাবছিলেন? বিকল্প বিন্যাসের যে-বৃত্তটাকে আমরা সংকীর্ণ বলে ভাবতে চেয়েছি এতক্ষণ আগানবেগিয়ান তাঁর তত্ত্বদৃষ্টিতে সেই বৃত্তটাকে সম্ভবত আরও সংকীর্ণ করে আনছেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ত শুরু থেকেই পুঁজিবাদের সমধর্মী প্রযুক্তিতে আস্থাবান ছিল। প্রযুক্তির সমাজতত্ত্ব নিয়ে ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্র তেমনভাবে চিন্তিত ছিল না কোনও-দিন। সংস্কারপ্রচেষ্টার বিভিন্নপর্বে টেকনিকাল ত্রুটিবিচ্যুতির কথা কিছু কিছু ভাবা হয়েছে, কিছু কিছু দুর্বলতা হয়ত সামলে নেবারও চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু প্রশ্নটাকে তেমন-ভাবে দার্শনিক স্তরে উপস্থাপনা করা হয়নি কখনও। ফলে বিকল্প বৃত্তের যে-কথাটা ভাবছি তাকে স্পর্শ করা যায়নি। আগানবেগিয়ানের সংস্কারচিন্তাতেও তার কোনও লক্ষণ নেই। ১৯৮৮-তে এক সাক্ষাৎকারে তিনি কীভাবে কমপিউ-টার প্রযুক্তির ওপর জোর দিচ্ছেন এবং বার্তাপ্রযুক্তিকে তিনি কী চোখে দেখছেন তা এই প্রসঙ্গে বেশ তাৎপর্যবহ। তাঁর চিন্তায়:

> আমরা ত সবাই জানি যে প্রযুক্তিগত প্রগতির মোক্ষম চাবিকাঠি হল বার্তা প্রযুক্তি। ১৯৮৬-তে বিশ্ব অর্থ-নীতিতে একটা বড় ব্যাপার ঘটেছিল: কম্‌পিউটার-এর প্রয়োগ বৈদ্যুতিকীকরণকে ছাড়িয়ে গেল। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী দেশে কম্‌পিউটার-এর ওপর খরচ জ্বালানি ও অন্য শক্তির ওপর খরচকে ছাপিয়ে গেল। পুঁজিবাদী বিশ্বে কম্‌পিউটার-এর উৎপাদন মোট উৎ-পাদনের দশ শতাংশ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এর পরিমাণ অনেক কম। এটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক যে আমরা শুধু মোট উৎপাদন এবং নীট বৃদ্ধির হিসেবেই কেবল পিছিয়ে আছি তাই নয়, বৃদ্ধির হারেও পিছিয়ে আছি আমরা।
>
> সুড়ঙ্গের শেষে কোনও আলোর রেখাও যে দেখা যাচ্ছে তা নয়। জ্বালানি ও অন্যান্য শক্তির সরবরাহের জন্য গসপ্লান-এ চারটে আলাদা বিভাগ রয়েছে, কিন্তু কম্‌পিউটার-এর জন্য বিশেষ ভারপ্রাপ্ত একটা বিভাগও নেই। ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত বিকাশের চাবিকাঠি ত এই কম্‌পিউটারেই।
>
> (**পেরেস্ত্রৈকা ইন অ্যাকশন্‌**: সোভিয়েট সিন্‌ ১৯৮৮, প্রোগ্রেস পাব্লিশার্স, মস্কো)

প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক এই চিন্তাটাকেই বলছিলাম বিকল্প বৃত্তের সংকীর্ণতা। শুধু এই পথেই সুড়ঙ্গের শেষে কোনও আলোর রেখা সত্যিই দেখা যাবে কিনা বেশ সন্দেহ হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনারত প্রোফেসর সৌরীন ভট্টাচার্য আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর গভীর বিশ্লেষণ ধর্মী লেখার জন্যে সুধীমহলে বিশেষ পরিচিত।

অনেকদিন পরে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বহুদিন পর আবার ইচ্ছে করছে
একটু গোল্লাছুট খেলি ! গোল্লাছুট ছোঁয়াছুঁয়ির ক্রীড়া
স্পর্শ এড়িয়ে পারবো কি উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ুতে তেমন, বালিকার ফ্রকের বয়স
হঠাৎ ছুঁয়েই বলবো তোকে "মরা" করে দিলাম, এবার
আমি ছুটবো তুই আমাকে ছোঁ।
বহুদিন পর আজ হঠাৎ "পদ্মার ঢেউ রে" গাইতে গিয়ে
নিজেই চমকে উঠি ! আরে আরে
আমি এত ভাল গাইতে পারি নাকি !
পদ্মার বদলে অবশ্য একটু বদলে গাই "গঙ্গার ঢেউ রে
মোর হৃদয় গঙ্গা নিয়ে যা, যা রে"……
না, হৃদয় নেয় না গঙ্গা—যায় না কোথাও, কেননা সে জানে
সমুদ্রের রকম আমি অনেক আগেই জেনে গেছি !
আসলে তো একবার 'বুড়ী' ছেড়ে এলে কেবল দৌড়তেই হয়,
কেউ ছুঁয়ে দিলেই 'মরা'—কেউ না ছুঁলেও তাকে
বড় করে নিয়ে যৌবন বসিয়ে করতে হয় নির্মম বাহুর ব্যাধ,
ইন্দ্রিয় তখন খুব এলোমেলো খঞ্জনী বাজায়, মনে পড়ে
কে প্রথম বালিকার হাত হয়ে আমাকে প্রথম ছুঁয়ে
দৌড় থামিয়েছিল। এখন শুধুই ভাবা, শুধু মনে হওয়া,
যা আর জীবনে ফিরবে না তাকেই লোভীর মতো প্রত্যাবর্তনে চাওয়া…

আজ খেলি যা খেলার নয়,
বলি, যা বলা কখনই উচিত ছিল না,
আজ অনেকদিন পরে আমার কেবলই মনে হচ্ছে
আমি কোনদিন বয়স শিখিনি ভাল করে।

যা কিছু জরুরি

সন্তোষ চক্রবর্তী

তার উজ্জ্বলতা আর প্রতিশ্রুতি
দীর্ঘকাল এখানে থাকা সব দিক দিয়ে
জরুরি ছিল
অথচ জনারণ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে
ঘড়ি বেজে উঠল।
ভালবাসা রেখে ফিরে গেল পথিক।

চারিদিকে প্রেম ডালপালা মেলে
খুঁজে খুঁজে খুঁজে রক্তাবলী
দুর্গম পথের ওপার থেকে আলোর তাঁড়ার
ধূসর চুলে সেই তন্ময়
সেই যাযাবর
মেধারশ্মি
মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া বড় জরুরি
ছিল।

অথচ যা কিছু জরুরি সব নিহত।

পৃথিবীর ক্ষয়ক্ষতি পৃথিবী জানে না, মূঢ়।

অভিনব রামরাজ্যে

উর্মিলা চক্রবর্তী

রক্তের অক্ষর পিপড়ের সারির মতো
সরযূর দিকে চলেছিল
অভিনব রামরাজ্যে
শকুনের দল ছিল পাহারায়
শিকারী কুকুর ছিল অযোধ্যার পথে।

ভুলপথে পায়ে পায়ে ধুলো উড়েছিল
চোখে ঠুলি প'রে চেনা সূর্য
একান্ত অচেনা হ'য়ে গেলে
শকুনের দল ছিল পাহারায়
শিকারি কুকুর ছিল অযোধ্যার পথে।

তারপরে সব নদী ক্রমশঃ সরযূ হ'য়ে গেছে
সব রাস্তা অযোধ্যার শেষ হ'লে
পরাজিত লক্ষ মুখ ঘোলাজলে দেখেছে বিকৃত প্রতিচ্ছায়া
ব্যগ্র শকুনের দল পাহারায়
অযোধ্যার পথে পথে শিকারী কুকুর।

ক'টা লাশ, এই প্রশ্ন শুধু
মৃত্যুর নির্দয় মুখ ঢেকে দিলে
সব লাশ ভেসে গেছে সরযূর জলে
শকুনের দল অতন্দ্র পাহারা ছিল
শিকারী কুকুর ছিল অযোধ্যার পথে।

দুঃস্বপ্নে ক্লান্তিতে গড়া হতাশার অন্ধকার
শিকলের মতো টেনে টেনে
আধপোড়া শহরের পাঁজরে পাঁজরে হেঁটেছিল কবন্ধ সময়
লোভী শকুনের দল পাহারায়
রক্তঝরা কুকুরের মুখ অযোধ্যার পথে।

বিদ্যাসাগর

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

কারমাটারে যে প্রৌঢ়কে একদা মৃত্যু, তুমি
ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে হত্যা করেছিলে, সে কিন্তু
তোমাকে ক্ষমা করেছে, কেননা তিনি মৃত্যুই
চেয়েছিলেন, অকৃতজ্ঞ বাঙালীর দায়ভাগ
তিনি আর বহন করতে রাজী ছিলেন না।

তবু আমি জানি যেদিন মহাভারতকার
বিরাট মহাভারত রচনা করেছিলেন, সেদিন তুমি
যেমন পরাজিত হয়েছিলে, তেমনি 'প্রথম ভাগ'
রচিত হবার পর তুমি আর একবার শংকিত
হ'য়ে পড়েছিলে, বরং আরও গভীরতর ভাবে
যেহেতু 'প্রথম ভাগে'র অবিনশ্বর 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'
আর এক অবিনশ্বর কাউকে উজ্জীবিত করার
প্রতিশ্রুতি নিয়ে লিখিত হয়েছিলো,
আর স্বল্পাকৃতি 'প্রথম ভাগ' তাঁর চটিজুতোর মতোই ছিলো
অমোঘ।

জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আজাদ

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে। সেইজন্যই ভারতীয় রাজনীতি যখন সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা ও দ্বন্দ্বের পথে এগিয়েছে, তিনি চেয়েছেন তার মোড় ফেরাতে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হননি সমকালীন রাজনীতির জটিলতার জন্য—সেই ক্ষোভ তাঁর ছিল আমৃত্যু।

আসলে, তিনি স্বাধীন চিন্তার পথ ধরেছিলেন বাল্যকাল থেকেই। তিনি নিজেই লিখেছেন—তাঁর জন্ম হয়েছিল এক গোঁড়া পরিবারে, সেখানে প্রচলিত আচার-আচরণের কোনও ব্যতিক্রমের সুযোগ ছিল না। অথচ তারই মধ্যে আজাদ চেয়েছেন স্বাধীনভাবে চলতে—'I felt that I must find the truth for myself. Almost instinctively began to move out of my family orbit and seek my own path.' (India Wins Freedom, পৃ: ৩)। ক্রমে তিনি মনের দিক থেকে পরিচিত গণ্ডির বাইরে চলে গিয়েছেন—তখন তিনি নাম নিয়েছেন 'আজাদ'—অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ।

এই মানসিকতার জন্যই তিনি কায়রো গিয়েও বিখ্যাত আল্ আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান নি, তাঁর মনে হয়েছে সেখানকার শিক্ষা-পদ্ধতিই ত্রুটিপূর্ণ। আর মিশর ছাড়াও তিনি তুরস্ক ও ফ্রান্সে গিয়েছেন যার ফলে তাঁর মনের দিগন্ত ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে। ব্রিটেনেও তাঁর যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

তাঁর সময়ে মুসলিম পরিবারের ছেলেদের প্রধানত পড়তে হত পারসিক ও আরবি ভাষা। কিন্তু আজাদ ইংরেজিও শিখেছেন। বিশেষ করে, ইতিহাস ও দর্শন-শাস্ত্র তাঁকে আকৃষ্ট করেছে—তিনি পরিচিত হয়েছেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে।

তাঁর মানসিকতা, শিক্ষা ও দেশভ্রমণ তাঁকে দিয়েছে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি। ফলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের ছোটো ত্রুটি স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন। প্রধানত, তাঁর মনে হয়েছে মুসলিম লীগ ওই বৃহৎ গোষ্ঠীকে সঙ্কীর্ণ চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। স্যার সৈয়দ আহমেদ তাঁদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী করেছেন সত্যি, কিন্তু শিখিয়েছেন ব্রিটিশ ভক্তি। দ্বিতীয়ত, তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগ্রহ দেখান নি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে—অথচ তাঁদেরও টেনে আনা দরকার স্বাধীনতা আন্দোলনে। আরব দেশে আজাদ যখন কিছুদিন ছিলেন—সেখানকার বিপ্লবীরা তাঁকে বলেছিলেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান সম্প্রদায় যে আগ্রহ দেখান নি, এটা বিস্ময়ের বিষয়। আজাদ তখনই ঠিক করেছিলেন যে, দেশে ফিরে তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন—'I felt it necessary to create a new movement among Indian Muslims and decided that on my return to India, I would take up political work with greater earnestness'. (ঐ, পৃ: ৭—৮)।

তিনি বুঝেছিলেন যে, আগে দরকার একটা পত্রিকা প্রকাশ করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ১৯১২ সালের জুনে 'আল্ হিলাল' পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা শুরু করেন। আজাদ নিজেই স্বীকার করেছেন, ওই পত্রিকা তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। দুই বছরের মধ্যে পত্রিকাটার সাপ্তাহিক বিক্রী সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ২৬,০০০—এটা ছিল এক অভাবনীয় ব্যাপার ('...a feagure which was still then unheard of in Urdu journalism." ঐ, পৃ: ৮)। বলা বাহুল্য, গোঁড়া মুসলমানরা—বিশেষত আলিগড় প্রভাবিত লীগ, নেতারা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এমন কি তখন আজাদকে হত্যা করার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল (পৃ: ৮)।

১৯১৫ সালে—যুদ্ধের সেই জটিল পরিস্থিতিতে পত্রিকাটা সরকার বন্ধ করে দেয়। আজাদ তখন 'আল বালাগ' নামে নতুন পত্রিকা প্রকাশ করেন, তবে ১৯১৬-র এপ্রিলেই তাঁকে সরকার গ্রেপ্তার করে—পত্রিকাও তখন বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু শুধু লেখা দিয়ে নয়—আজাদ তখন কাজে-কর্মেও সরকার বিরোধিতা শুরু করেছেন। বলা বাহুল্য তিনি মুসলিম লীগে নাম লেখান নি, যুক্ত হয়েছেন গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে।

তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতাটা ছিল তিক্ত। বিপ্লবী দলগুলো তখন ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত ব্যক্তিদের হাতে। তাঁরা অনেকেই ছিলেন মুসলিম বিরোধী, কারণ ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের পরিকল্পনা-মাফিক ব্যবহার করতে শুরু করেছেন কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। আজাদ তাঁর হিন্দু-সঙ্গীদের তখন অবিরত বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলমানদের সকলেই সরকারের হাতের পুতুল নন—তাঁদের অনেকেই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তাঁর দুঃখ ছিল—প্রথম দিকে বিপ্লবীরা তাঁকে বিশ্বাসই করতেন না—'At first, they did not fully trust me and tried to keep me outside their inner councils.' (ঐ, পৃ: ২)।

অথচ তাঁর সম্প্রদায়েরও বিরাট একটা অংশের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তিনি পাননি। তিনি ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের সব চেয়ে প্রগতিশীল নেতা—নেহেরুর ভাষায় 'the most dynamic' (An Autobiography, পৃ: ৪৬৬)। ডঃ রাজেন্দ্র প্রাসাদও স্বীকার করেছেন—আজাদ ছিলেন জাতীয়তাবাদের মূর্ত আদর্শ—'high ideals of nationalism'—(India Divided, পৃ: ১১১)। কিন্তু লীগ নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত নিন্দাবর্ষণ করেছেন। বিশেষ করে এঁরা জাতীয়তাবাদী জিন্না মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পরে যখন তাঁর দলকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন তখন তিনি আজাদকে চিহ্নিত করেছেন চরম শত্রু হিসেবে। P. Mehra লিখেছেন—'Jinnah took every opportunity for insulting him; the Muslim press kept on cursing him, he was abused from every quarter.' (A Dictionary of Modern Indian History, পৃ: ৫৫)।

আসলে, আজাদ কোনও রকম সঙ্কীর্ণ রাজনীতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন নি। তিনি চেয়েছেন ভারতবাসীর স্বাধীনতা, তার মধ্যে কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে টানা তিনি পছন্দ করেন নি। সেইজন্যই ১৯২১ সালের খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীজী তাঁর সংগ্রাম মিশিয়ে দেওয়ায় আজাদ উৎসাহিত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া স্বাধীনতার স্বপ্ন হবে অর্থহীন। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (দিল্লী) তিনি বলেছেন—এই ঐক্য ছাড়া সমস্ত প্রয়াসটাই হবে অসংলগ্ন স্বপ্ন ('disjonted dream')। তাছাড়া ওই ভাষণে তিনি তুরস্কে কামাল পাশার সংস্কারনীতি ও আধুনিকীকরণেরও প্রশংসা করেছেন, তিনি চেয়েছেন অন্তত ও এই প্রগতিশীলতার জয়যাত্রা (উদ্ধৃত, Arsh Malsiani—Abul Kalam Azad, পৃ: ১৭০—৭১)।

তাঁর কিন্তু প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, এদেশের মুসলমানরা ভ্রান্ত নেতৃত্বের শিকার (তাঁর ভাষায় misguided leadership—জামা মসজিদের ভাষণ, ১৯৪৮, ঐ, পৃ: ১৬৬)। প্রথমত, ইংরেজ সরকার এই বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং তা জিইয়ে রেখেছে। আর, দ্বিতীয়ত কিছু স্বার্থান্বেষী নেতা তাতে ইন্ধন দিয়েছেন।

বিশেষ করে, তিরিশের দশকে লীগ নেতৃত্ব জিন্নার হাতে গেলে আজাদের অস্বস্তি বেড়েছে। জিন্না প্রচার করেছেন সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কাছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবশ্যম্ভাবী অবিচারের কথা, অথচ তিনিও জানতেন জনসংখ্যায় এই তারতম্য পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই—'Here we have a permanent Hindu majority and the rest are minorities which, cannot, within a conceivable period of time, hope to become majorities.' (উদ্ধৃত, Some Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah, Ed. Jamil Uddin Ahmed, পৃ: ৪১)। তাঁর মতে, এই অবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হবেই। এক্ষেত্রে গণতন্ত্র থাকতেই পারে না—ন্যায়নীতি ও মানবিক মূল্য সবই হবে তখন বিপর্যস্ত (Dr. A. Appadorai—Indian Political Thinking, পৃ: ৯৯)।

আজাদ কিন্তু মুক্তিটা মানতে পারেন নি। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি এই ভীতি ও বিভ্রান্তি দূর করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—এগারোটা রাজ্যের চারটাতে মুসলমানরাই গরিষ্ঠ—বৃটিশ বেলুচিস্তানের কথা ধরলে, সংখ্যাটা দাঁড়ায় পাঁচ। সুতরাং আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে এই সম্প্রদায়ের উচিত আশা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা করা। তিনি ঘোষণা করেছেন—'This being so, there is absolutely no reason why they should be oppressed by the feeling of

being a minority.' (উদ্ধৃত, Malsiani, ঐ, পৃ: ১৪১)।

বিশেষ করে, ১৯২০ সাল থেকে কংগ্রেসে থাকার ফলে তাঁর মনে হয়েছে ওই ধরনের প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেবে না, ধর্মীয় আবেগকে রাজনীতিতে মেশাবে না। কিন্তু এর জন্য জিন্না তাঁর কম নিন্দাবাদ করেন নি। ১৯৪০ সালের ৮ই অগস্টে তিনি আজাদকে লিখেছিলেন—'I refuse to discuss with you by correspondence or otherwise as you have completely forfeited the confidence of Muslim India. Can you not realise you are made a Muslim showboy Congress President to give it colour that it is national and deceive foreign countries? You represent neither Muslims nor Hindus. The Congress is a Hindu body, If you have self respect, resign at once.'—(Malsiani, ঐ পৃ: ৬৫)।

কিন্তু ১৯৩৭ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতি দ্রুত গতিতে সাম্প্রদায়িক উগ্রতার দিকে ছুটেছে। বিশেষ করে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী যে নির্বাচন হয়, তাতে বিপর্যয় ও হতাশা জিন্নাকে অনমনীয় করে তোলে। মুসলমানদের জন্য যে ৪৮২ টা আসন সংরক্ষিত ছিল, সেখানেও লীগ তেমন সুবিধে করতে পারে নি—কংগ্রেস ৮৮টা মুসলিম আসনে প্রার্থী দিয়ে ২৬ টাতে জয়লাভ করেছিল। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি ১৭৫টার মধ্যে ১০৬টা আসন দখল করেছিল—এই দলে মুসলিম-আধিক্য থাকলেও তাঁদের মধ্যে লীগের প্রভাব ছিল না। বাংলায় মুসলমান-আধিক্য ছিল ঠিকই—কিন্তু লীগ পেয়েছিল মাত্র ৪০টা আসন, স্বতন্ত্র মুসলমানরা পেয়েছিলেন ৪৩টা আসন। হক্-সাহেবের দল লাভ করেছিল ৩৫টা (J. P. Suda—Indian Constitutional Development, পৃ: ৩৪৯)। এই কারণেই ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, সেই সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর লীগের তেমন প্রভাব ছিল না। আরও বলা যায়—হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে তার যতটা প্রাধান্য ছিল, মুসলিম-গরিষ্ঠ অঞ্চলে ততটা ছিল না (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ: ২১৩)।

আটটা প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করায় লীগ শুরু করেছিল অন্য ধরনের রাজনীতি। জিন্না বারবার বলেছেন—এই ধরনের সরকারের কাছ থেকে ন্যায় বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আশা করা যায় না। ক্রমে নানা রাজ্যের আইন-সভায় ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কংগ্রেস-সরকারের পক্ষপাতিত্বের অজস্র অভিযোগ উঠেছে (Lal Bahadur—Muslim League, পৃ: ২৪৪)। পীরপুর কমিটি, সরিফ কমিটি প্রভৃতি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের রিপোর্ট কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু-স্বার্থহননের অসংখ্য অভিযোগ আনা হয়েছে। সরিফ রিপোর্ট বিহারে একেবারে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' দেখতে পেয়েছিল (Dr. J. C. Johari—Indian Government and Politics, পৃ: ১১৭)। অথচ, লক্ষ করার বিষয় হল—আজাদ এই সবের মধ্যে কোনও সত্যতা খুঁজে পান নি। তাঁর মতে, এগুলো ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ-যুক্ত অপপ্রচার ('absolutely unfounded'—ঐ, পৃ: ১৬)।

১৯৪০ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতি ঝুঁকেছে আরও সঙ্কীর্ণতার দিকে, আজাদ কিন্তু তখনও চেষ্টা করেছেন তাকে প্রতিহত করতে। সেই বছর লাহোর-সম্মেলনে জিন্না ঘোষণা করেছেন দ্বিজাত্বি-তত্ত্ব বা 'Two-Nation theory' যার মূল বক্তব্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানরা দুটো পৃথক জাতি, সুতরাং তাঁদের জন্য চাই দুটো আলাদা রাষ্ট্র। এই তত্ত্বের মধ্যে আজাদ ভারত-ভাগের ভয়াবহ ছবি দেখতে পেয়েছেন। তাই তিনি বারবার বলেছেন, সেটা ভুল তত্ত্ব—আর তার ভিত্তিতে দেশবিভাগ হলে ভারতের যেমন ক্ষতি হবে, তেমনি ক্ষতি হবে মুসলমানদেরও (J. H. Doglus—A. K. Azad, পৃ: ২২৪)। পরে, ১৯৪৮ সালের জামা-মসজিদ ভাষণে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন—'It is not long ago when I told you that the two-nation theory was the death knell of a life of faith and belief.'

তিনি হৃদয়-মথিত আবেগে রামগড়-ভাষণে (১৯৪০) বলেছেন, দীর্ঘকালের সান্নিধ্যে হিন্দু ও মুসলমানকে কাছে এনেছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে মিশে গেছে দুই ধারা, ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক মহান জাতীয়তা—একে কৃত্রিমভাবে ভেঙে দেওয়া অনুচিত—'Eleven hundred years of common history have enriched India with our common achievements. Our languages, our poetry, our literature, our art, our dress, our manners and customs, the innumerable happenings of our daily life—everything

bears a stamp of our joint venture···Three thousand years of our joint life have moulded us into a common nationality. This cannot be undone artificially'. (উদ্ধৃত, Malsiani, ঐ পৃ: ১৫৫-৫৬)।

সেইজন্যই যুদ্ধ-কালীন সঙ্কট-সময়ে সব বৈঠকেই তিনি চেয়েছেন ভারতকে অখণ্ড রাখতে। ১৯৪১ সালে ক্রিপ্‌স্ এসেছেন সমঝোতার জন্য। কংগ্রেস ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ তার সবই ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু লীগের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন—ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' দাবি স্বীকৃত হয় নি। তাঁর বক্তব্য ছিল—'the only solution of India's constitutional problem is the partition of India into indepndent zones।' অবিভক্ত ভারতের চিন্তা তখন ওই দলের কাছে এক অকল্পনীয় ব্যাপার—(Dr. N. S. Bose—Indian National Movement, পৃ: ১২২)।

আজাদ তখনই আশঙ্কা করেছেন—তাঁর ভারত-স্বপ্ন ব্যর্থ হতে চলেছে। ১৯৪৫ সালে বড়লাট সিমলায় বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে বড়লাট প্রস্তাব দিলেন, তাঁর কাউন্সিল গঠিত হবে ভারতীয়দের নিয়েই। কিন্তু বৈঠক ব্যর্থ হল জিন্নার এক অদ্ভুত দাবিতে—অন্য কোনও দল (অর্থাৎ কংগ্রেস) কোনও মুসলমান সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে না। মুসলিম সদস্য হবেন লীগেরই লোক। (De, Tripathi, Chandra — Freedom Struggle, পৃ: ২২৪)।

কিন্তু ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আজাদ উৎসাহ নিয়েই সহযোগিতা করেছেন, কারণ তাঁর প্রস্তাবে ভারতকে অখণ্ড রাখার প্রয়াস ছিল। যদিও তাতে রাজ্যগুলোকে তিনটে বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের থাকার কথা ছিল একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে। তাছাড়া অখণ্ড রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার জন্য একটা গণপরিষদ রচনা করার কথাও তাতে বলা হয়েছিল।

কংগ্রেস ও লীগ এই প্রস্তাব মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়ায় আজাদ স্বস্তি লাভ করেছিলেন—তাঁর মনে হয়েছিল এটা একটা ইতিবাচক ও উৎসাহজনক ঘটনা। কিন্তু বিপদ ঘটালেন নেহরু। ১০ই তিনি হঠাৎ জানালেন—কংগ্রেস গণপরিষদে যাবে, কিন্তু সেখানে সে কোনও শর্ত দ্বারাই আবদ্ধ নয়। তাঁর জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার লিখেছেন—এটা ছিল নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের সব চেয়ে উত্তেজক মন্তব্য—('one of the most fiery and provocative statements in his forty years of public life—' Nehru, পৃ: ১২১)।

আজাদের মতে, এতে জিন্নার সুবিধে হয়ে গেল। তিনি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বলতে পারলেন যে, তাঁর এতকালের আশঙ্কাই কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আজাদ লিখেছেন—'I saw that the scheme for which I had worked so hard was being destroyed through our own action'—(ঐ, পৃ: ১৬৬)। অবশ্য জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে মন থেকে মানেন নি, কারণ তাতে 'পাকিস্তানের'-এর কথা ছিল না—তাঁরা শুধু সংবিধান রচনার ব্যাপারে অংশ নিতে চেয়েছেন (Dr. S. N. Sen—History of the Freedom Movement of India, পৃ: ১৩৭)। কিন্তু নেহরুর ঘোষণা শুনে জিন্না একটা অজুহাত পেয়ে গেলেন এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্টকে চিহ্নিত করলেন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) দিবস' হিসেবে।

এর ফলে ঘটল নারকীয় ঘটনাবলী। দুই সম্প্রদায় এক মর্মান্তিক হত্যা-লীলায় মেতে উঠল। জিন্না বুঝিয়ে দিলেন—ওই দুই সম্প্রদায়ের মিলন অসম্ভব—সমাধানের একমাত্র পথ দেশ বিভাগ।

মীমাংসার জন্য লণ্ডন ও দিল্লীতে বৈঠক হল বারকয়েক। শেষে একটা অন্তবর্তী সরকার (Interim Government) গঠন করার ব্যবস্থাও হল, যদিও লীগ প্রথমে এতে যোগ দেয় নি। শেষ পর্যন্ত লীগ এতে এল বটে, কিন্তু তখন তার উদ্দেশ্য ছিল সব কিছু অচল করে দেওয়া। ওয়াভেল চেয়েছিলেন লীগকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়া হোক—আজাদেরও সেটাই ছিল ইচ্ছে। কিন্তু প্যাটেল এই দপ্তর ছাড়তে চান নি—তিনি দিতে চাইলেন অর্থ-দপ্তর। এটা ছিল মারাত্মক ভুল। অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি কংগ্রেসী-মন্ত্রীদের দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দই করতে চাইলেন না (B.N. Pandey—Nehru, পৃ: ২৭৩)। আসলে, অন্তবর্তী সরকারের কার্যকলাপই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মিলনের সেতু রচনা করা অসম্ভব। প্যাটেল চেয়েছিলেন—লীগ আগে প্রতিশ্রুতি দেবে যে, সরকারে ঢুকে অন্তর্ঘাত করবে না। নেহরু ও ও আজাদ তখনও সমঝোতার আশা ছাড়েন নি (Durga

Das—India : From Curzon To Nehru, পৃ: ২৩২)।

কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে কাজ করার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের মনে এই ধারণা এনে দিয়েছিল যে, এর চেয়ে বরং দেশভাগই ভাল। এক্ষেত্রে জিন্নার ছকটা নিশ্চয় কাজে দিয়েছে।

মাউন্টব্যাটেন কার্যভার নেওয়ার (২৩. ৩. ৪৭) পরে ব্যাপারটা সেই দিকেই গিয়েছে। তিনি এসেই বুঝেছিলেন যে, দেশভাগ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। তবে এই ব্যাপারে কংগ্রেস-নেতাদের দ্বিধা ছিল বলে তিনি এই দলের প্রধান নেতাদের প্রভাবিত করতে চেয়েছেন।

আজাদের মতে, বড়লাটের কাছে প্রথম আত্মসমর্পণ করেছেন প্যাটেল এবং তারপরে নেহরু। আজাদের তখন ভরসা গান্ধিজী। তিনি গান্ধিজীকে বলেছেন—একমাত্র তিনিই পারেন ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করতে। গান্ধিজী উত্তর দিয়েছেন—'If the Congress wishes to accept partition, it will be over my dead-body. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India.' (India Wins Freedom, পৃ. ২০৩)। কিন্তু আশাভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে তিনি লিখেছেন—প্যাটেল এসে গান্ধিজীর সঙ্গে দু-ঘণ্টা নিভৃতে কথা বলেছেন আর তারপরেই গান্ধিজী বদলে গিয়েছেন—'But when I met Gandhiji again, I received the greatest shock of my life to find that he had changed.' (পৃ. ২০৩)। ততদিনে বশীভূত হয়েছেন নেহরুও—এক্ষেত্রে অবশ্য বেশি প্রভাব পড়েছে বড়লাট পত্নীর—'I think one factor responsible for the change was the personality of Lady Mountbatten.' (ঐ, পৃ. ১৯৮)। তাছাড়া নেহরুকে কিছুটা প্রভাবিত করেছেন কৃষ্ণ মেনন। কিন্তু আজাদ অন্য নেতাদের বলেছেন—শেষ পর্বে কংগ্রেস নেতারা দেশভাগের ব্যাপারে জিন্নার চেয়েও আগ্রহী হয়েছেন, ইতিহাস কিন্তু তাঁদের ক্ষমা করবে না। গান্ধিজীকে তিনি বলেছেন—দুটো বছর ক্ষমতা-হস্তান্তর ঠেকিয়ে রাখতে—তাতেই হয়ত একটা সমঝোতা হত (…'two years is not a long period in a nation's history.' (ঐ, পৃ: ২০৫)। ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানটা ধরে থাকলেই কাজ হত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

তাঁর এই সময়কার যন্ত্রণা মূর্ত হয়েছে তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে। তাঁর মতে, ভুল অনেক হয়েছে। প্যাটেলের ভুল হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর লীগকে না ছাড়া। নেহরুর প্রথম ভুল ১৯৩৭ সালে লীগের বিপর্যয় দেখে তাকে অবজ্ঞা করা এবং কোয়ালিশনের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়া। কথাটা সত্যি—নেহরু সেদিন বলেছিলেন ভারতীয় রাজনীতিতে আছে দুটো পক্ষ—ইংরেজ-সরকার ও কংগ্রেস। তিনি কিন্তু লীগের শক্তিকে উপেক্ষা করেছেন—(Dr. R. C. Majumdar—History of the Freedom Movement in India, Vol. III,) তাঁর দ্বিতীয় ভুল ক্যাবিনেট মিশনের ব্যাপারে দায়িত্বহীন মন্তব্য করা। গান্ধিজীর ভুল—রাজনীতিতে নিষ্প্রভ জিন্নাকে হঠাৎ 'কায়েদে আজম' সম্বোধন করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর মর্যাদা-বৃদ্ধি করা। আজাদ লিখেছেন—'Many of them developed a new respect for Jinnah. They also thought that Jinnah was perhaps the best men for getting advantageous terms in communal settlement.' (ঐ, পৃ: ১৭)।

সত্যিই তাই। চরম হতাশার মধ্যে জিন্না দেশ ছেড়ে প্রিভি কাউন্সিলে আইন-ব্যবসায় করার জন্য বিলেতেই বসবাস শুরু করে ছিলেন যখন, লিয়াকৎ আলি তাঁকে অনেক অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনেন (L. Mosley—The Last Days of The British Raj, পৃ: ৬৮-৬৯)। আর গান্ধিজী হঠাৎ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, ফলে আমাদের রাজনীতি দেশবিভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। অবশ্য জিন্নারও মোহভঙ্গ হয়েছিল, শেষ-জীবনে তিনি চেয়েছিলেন দুই রাষ্ট্রের পুনর্মিলন।

কিন্তু এতগুলো ভুলের ফলে তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ নিয়েই আজাদ প্রশ্ন তুলেছেন—'Can any one deny that the creation of Pakistan has not solved the communal problem, but made it more intense and harmful ?'—(ঐ, পৃ: ২৪৭)।

ক্ষমতার লোভে সেদিনের অভ্রান্ত নেতারা এটা পরবর্তী কালেও বুঝেছিলেন কিনা, কে জানে!

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিতের পেশা অধ্যাপনা।

সাপ লুডো

জয়কৃষ্ণ কয়াল

ছুটিছাটার দিনগুলোয় দুপুরের খাওয়া শেষ হলে বিজলী মাঝেমধ্যে সাড়া দেয়—কী গো, হবে নাকি আজ ?

—কী ?

—সেই তাই !

তাইটা কী অবশ্য আর ভেঙে বলে না সে। দরকারও হয় না। চাপা ঠোঁটে টিপে টিপে হাসে। ভুচোখের উচ্ছল রহস্যে ভ্রূবন্ধনী তোলপাড় করে। এসব মুদ্রার ভাষা যথেষ্ট পরিচিত আমার। কী বলতে চায় সুতরাং অসুবিধে হয় না বুঝতে।

লুডো খেলতে চায় সে—সাপ লুডো। কী মজা পায় এতে তা কে জানে !

এসব চুমকি বিলাস আমার কিন্তু মোটে পোষায় না। তাই বলে না বলতেও পারি না। উৎসাহ আর আগ্রহে ও যেন তখন আলোভরা একটি কাচের পুতুল, টান টান সুরে বাঁধা কোনও তারযন্ত্র বিশেষ। আমি না বললেই যেন সেই পুতুলের কাচ ভেঙে চুরমার অন্ধকার ছড়িয়ে যাবে, তার ছিঁড়ে আছড়ে পড়বে যন্ত্রের কেঠো কঙ্কালটি। মানুষের আসল আকর্ষণ ও তার ভিতরের এই লুকোনো সুর আর আলো। না হলে ত সব নীলামবালা। ত বলা যায় সেই সুর আর আলোর মুখ চেয়েই আমাকে সাড়া দিতে হয় বিজলীর সাপ লুডোর আমন্ত্রণে।

কালও আমরা ঘুঁটি সাজিয়ে ছক পেতে বসেছিলাম সবে। এমন সময় লক্ষ্মী এসে হাজির হল ওর বোনঝিকে নিয়ে। বারান্দার যেখানটায় বসে আমরা খেলছিলাম লক্ষ্মী সেখানটায় বসে পড়ল পা ঝুলিয়ে, আর বোনঝিটা সোজা এগিয়ে গেল উঠোনে, আমাদের টিউবওয়েলটার কাছে। কলের মুখে হাত চেপে পরপর ক'বার পাম্প করে সে কলটা বোঝাই করে নিল জলে, তারপর হাতটা সামান্য ফাঁক করে সেখানে ঠোঁট চেপে একবারে অগস্ত্যটান।

বিজলীকে উদ্দেশ করে লক্ষ্মী আরম্ভ করল—এই আমার সেই বোনঝি গো বৌদি। তুমি কাজের নোকের কথা বলেছিলে, তাই আনলোম। তুমি আছ, দাদাবাবু আছে—কথাবাত্তারা বলে ছাখো তোগোর চলবে কিনা।

আমার থ দৃষ্টি তখন উঠোনে কলের দিকে। বিজলীরও দেখি ভুরু ছাপিয়ে কপাল থৈ থৈ করছে বিরক্তিতে। বুঝতে পারি মেয়েটার এই অশ্লীল পানাভ্যাস মোটেই বরদাস্ত করতে পারছে না সে। লক্ষ্মীকে জিগ্যেস করে—ও কী খেয়েছে বল ত, এই অসময়ে এত জল গিলছে কেন ?

—কী আর খাবে গো বৌদি, লক্ষ্মী জানায়—সেই আটটার দিকি এট্টা বাসি উটি। চা তাও খায় না। বলে নাকি জিভ পুড়ে যায়। ভাত পান্তা থেকো ধাত কিনা। বলতে বলতে মেয়েটা ফিরে এসে দাঁড়ায় তার কোল ঘেঁষে। বিজলীর বিরক্তি বুঝি টের পেয়েছে সে। চোখে টোল খাওয়া দৃষ্টি। ভুকুতে, নাকের ডগায়, কপালে চুলের সঙ্গে জলের সোহাগ। লক্ষ্মী আঁচল দিয়ে যত্ন করে মুছিয়ে দেয় তা। তারই ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটা জ্বলজ্বলে চোখে আমাদের নক্সাকরা বারান্দা দেখে, গ্রীলের পদ্মফুল দেখে, বিজলীর শাড়ির প্রিন্ট দেখে এবং হয়ত বা আমার সরু গোঁফ এবং টাকের চিকন মসৃণতাও।

জিগ্যেস করি—নাম কী রে তোর ?

—বেম্পতি। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় সে। তারপর মাসির আঁচল দিয়ে আনমনে আঙুলে জড়ায়, খোলে, ফের জড়ায়, ফের··· লক্ষ্মী তার নামের ব্যাখ্যা শোনায়—বেস্পতিবারে হয়েছিল কিনা, তাই। কী মনে হতে হঠাৎ সে মেয়েটার মুখ আঁজলা করে তুলে ধরে আমাদের দিকে। বলে—হতচ্ছাড়ার চোখমুখির টানটাও একবার ছাখো কেমন। মা ছগ্‌গার মুখ যেন কেটে বসানো। দেহের রঙটাও তেমনি, সোনা গলে পড়তেছে। তাও যদি তোগোর মতো সুখি থাকত গো দাদাবাবু! দুঃখির কথা আর কী বলব। বাপ মুখপোড়া মদ মেয়েমানুষ নে কেচ্ছা করে ঘুরতেছে। এদিকি মাগ ছাবাল সব ভেসে বেড়াচ্ছে। আদ্দেক দিন খাওয়া হয় না বাছাগার। বোনটারে যদি তখন কেটে

গাঙের জলে ভেইসে দেতোম গো বৌদি!

—চুপ করো ত তুমি! বিজলী ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় তাকে। দুপুর বেলা, এলম্বীর পাঁচালি বুঝি ভাল লাগছিল না তার। বলে আমাদের কাজের কথা ত বলেছি তোমাকে! মাইনেপত্র কী দিতে হবে বল!

—সে আর আমি কী বলব, তোমরা এট্টা বল না বিবেচনা মত। বলে সে পালাক্রমে তাকায় একবার আমার আর একবার বিজলীর দিকে। জবাবটা কার কাছ থেকে আসবে যেন ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। কলের হাতলে একটা কাক ধ্যা ধ্যা করছিল। বেস্পতি হাত তুলে তাড়া দেয়—হে-এ-এ-ই। চোখ বড় বড় করে লক্ষীকে বলে এই সেই কাগটা গো মাসি। সেদিন আংগার তেঁতুল গাছে বসেছিল, আমার বোনির হাত থেকে বিস্কুট কেড়ে খেয়েছে!

তার বলার ধরন দেখে হেসে ফেলি। জিগ্যেস করি—কী করে জানলি যে এই কাকটাই তোর বোনের হাত থেকে বিস্কুট কেড়ে খেয়েছে?

—কেন, ওই ত কাগটার ঘাড়ের কাছে চুল নি। সে কাগটারও ঘাড়ে চুল ছিল নি।

তাকিয়ে দেখি সত্যিই, ঘাড়ের কাছে পালক নেই কাকটার। কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে এক থাবলা। কিন্তু তাই বলে এই কাকটাই যে সেই কাকটা তা কে বলবে! ঘাড়ে পালক না-থাকা কাক দেশে কি একটাই?

সেই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম মেয়েটিকে। তখন ওদের চোখ এড়িয়ে বিজলী আঙুলের মৃদু চাপ দেয় আমাকে। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট—নাও, কাজের কথা বল!

কিছু বলতে গিয়ে আবার আমার নজর আটকে যায় বেস্পতির মুখে। কত আর বয়স হবে ওর—নয়-দশ, নাকি আর একটু বেশি! বোঝা মুস্কিল। শুকনো হাড্ডিসার চেহারা। গায়ের রঙটা অবশ্য কালো নয়, তাই বলে সোনা গলে পড়ার মতও নয়। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোয় যেন কতদিন তেল-চিরুনির ছোঁওয়া জোটে নি। পরনে একটা প্যান্ট, দুটো দু'রঙের পুরনো ঢোলা ব্লাউস বুকের কাছে পিঁজি দিয়ে পরা। হাতে ক'গাছা চকমকে চুড়ি—নতুন, সম্ভবত আজই কেনা। চুড়িতে সেফটিপিন। এ সবের সঙ্গে মা দুর্গার কোথায় যে মিল খুঁজে পাই না।

বেস্পতির মুখের দিকে আমার দৃষ্টির এল ওড়ান্তি লক্ষ করে বিজলী। বোধহয় ভাবে যে ওর আঙুলের সংকেত আমি বুঝতে পারিনি। বলে—কী দেওয়া যায় না যায় বলবে ত! অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?

তাকিয়ে! হাঁ, তাকিয়েই ছিলাম। বেস্পতির জল খাওয়ার দৃশ্যটা তখন বেস্পতিকে আড়াল করে ভাসছিল আমার চোখের সামনে। এক নিঃশ্বাসে কত খানি জল টানল মেয়েটা। সে কি তেষ্টা, না খিদে! চোখ দুটো মেয়েটার সত্যিই ভাগর আর টানা। কিন্তু ক্লান্তি আর অবসাদে দৃষ্টি নিষ্প্রাণ। আনমনে লক্ষীকে বলি—তোমার বোনঝি কাজ করবে আর মজুরির কথা আমি কী বলব! তুমি বল কত চাও।

—ওই ফেলাটের ওরাও কাজের কথা বলেছে গো দাদাবাবু। আমাদের পাঁচিলের ওপারে সরকারি অফিসার বাবুদের বহুতল হাউসিং এস্টেট, আকাশ বাতাস আড়াল করে ছায়া হেনেছে উঠোনে। তারই একটা ফ্ল্যাটের দিকে ইঙ্গিত করে লক্ষী। বলে—ওরা একশ টাকা দেবে বলেছে। কিন্তু আমি অগ্‌গেরে বৌদির সঙ্গে কথা বলে-ছেলাম। তাই তোংগার মুখ থেকে কিছু না শুনে ওগার জবাব দোব নি।

ফ্ল্যাটের ওদের কথা শুনে বিজলী নড়ে চড়ে বসে। আমি আবার বেস্পতিকেই দেখি। রোগা নীরক্ত চেহারা। কতকাল যেন ভুগছে অপুষ্টিতে। একটু আগের জল খাওয়ার দৃশ্যটা দিয়ে যেন ওর ভিতরের চাহিদা ও বুঝিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট করে। লক্ষীকে বলি—তুমি ত বলছ তোমার বোনঝি খেতে পায় না ঠিকমত। খেতে না পেলে কাজ-কর্ম করবে কী করে! এক কাজ কর তুমি—একশ টাকা নয়, মাইনেটা গোটা পঞ্চাশ নেও, আর দুপুরে ও বরং আমাদের এখানে খাবে দুটো করে। কী বল?

বিজলী বোধহয় একটু চমকায় প্রস্তাবটা শুনে। ভুরুতে ভাঁজ, দৃষ্টিতে আলোড়ন। হয়ত সন্দেহ জাগে যে আমার কথাগুলো সে ঠিক শুনল কিনা। লক্ষী অবশ্য আর অপেক্ষা করে না। বেস্পতির মাকে জিগ্যেস করে দু-একদিনের মধ্যে যা হোক জানাবে বলে চলে গেল তখনকার মত।

শীত আসার সময় হলেই বিজলীর জন্যে আমার দুর্ভাবনা শুরু হয়ে যায়। এমনিতে ও বেজায় শীতকাতুরে। তার ওপর কোন্ ফাঁকে কখন ঠিক ঠাণ্ডা লেগে যায়। তখন হাঁচি কাশি সর্দি জ্বর। বুকের মধ্যে কফ জমে নিঃশ্বাসে পাথর ভাঙার শব্দ। ভোগান্তির এক শেষ আর কী। কোনদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হয়ত দেখব বালিশে ঠেস

দিয়ে ভয়ে ভয়ে বসে আছে বেচারি। মুখ চোখ শুকনো, থমথমে, কারণ জানতে চাইলে বলবে—ঘুমোতে যেন ভয় করছে আমার। বুকের মধ্যে শব্দ হচ্ছে কেমন। মনে হচ্ছে ঘুমোলে হয়ত ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে মারা যাব কখন।

ওর নিঃশ্বাসের কষ্ট তখন গাঢ় হয়ে আমার বুকেও চেপে বসে। আমারও ঘুম ছুটে যায়। কে বলতে পারে, ঘুমোলে যদি ঘুমের মধ্যে সত্যিই কিছু হয়ে যায় বিজলীর! ভয়ে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আমিও তখন ওর জাগরণের সঙ্গী হয়ে যাই। ও বিব্রত অনুযোগ জানায়—এ কী, তুমি আবার জাগতে বসলে কেন! ঘুমোও, নাহলে শরীর খারাপ করবে যে।

বলেই হয়ত বুঝতে পারে যে ও নিজে না ঘুমোলে আমারও ঘুমোনো সম্ভব হবে না। তখন আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যেই বুঝিবা, ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। শোনায়—নাও, শুয়ে পড় এবার। আমি ঘুমোচ্ছি, তুমিও ঘুমোও। বেশি রাত জাগলে কাল কাজে বেরোতে কষ্ট হবে তোমার।

আমি শুয়ে পড়ি। মনে মনে বলি—তোমার কষ্টের চেয়ে আমার কষ্ট কি আরও বেশি কষ্টের বিজলী! মুখে বলি—আমি ত ঘুমোচ্ছি, তুমিও চেষ্টা করো ঘুমোবার।

পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করি দুজনে। যদিও বেশ বুঝতে পারি যে ঘুমোতে আমরা কেউ পারছি না। একজন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে কিনা তারই সতর্ক পাহারাদারিতে অজ্ঞজন জেগে আছি সন্তর্পণে এবং তাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ঘুমোনোর বরাদ্দ সময়।

বছরের মাঝখানে আগের কাজের মেয়েটি কাজ ছেড়ে দিল হঠাৎ। এতদিন বিজলী কোনরকমে চালিয়ে নিচ্ছিল নিজের মত। কিন্তু সামনে শীত আসছে। সকালে উঠে জল ঘাঁটাঘাঁটি মোটেই উচিত হবে না তার। একজন কাজের লোক তাই দরকার শীগগির। লক্ষীর বোনঝিকে পেলে সুবিধেই হত। কিন্তু তার খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে নতুন বিপত্তি শুরু হল আবার।

বেস্পতিকে নিয়ে লক্ষী বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। লুডোর ছক টেনে আমরা বসে পড়ি আবার। ঘুঁটি সাজাই। খেলা যেন ক্রমে খেলা হয়ে ওঠে। বিজলী হাসে—খুব সরু আর ধারাল করে। বলে—কী ব্যাপার বল ত, তুমি যে হঠাৎ খাওয়ার টোপ দিতে গেলে মেয়েটাকে?

টোপ শব্দটায় কেমন আঁশটে গন্ধ লাগে কানে। পছন্দ হয় না। বলি—ব্যাপার আবার কী, এমনিই বললাম। নাও, চাল দাও তুমি। ছুরি পড়লে সিঁড়ি, কিন্তু তিরি পড়লে সাপ। ছাখো কী পড়ে।

ছক্কাটা তুলে নেয় বিজলী, কিন্তু চাল দেওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। আমি চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করি, ও তখন ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে আসে মুখের কাছে। রহস্যের গলায় জানতে চায়—তুমি ওই সরকারি বাবুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করলে নাকি গো! তবে যে বল ওসব রেষারেষি, কমপি-টিশান ভাল লাগে না তোমার, পছন্দ কর না!

বিজলী হাসে, কিন্তু যেন জলের তলায় মুখ লুকিয়ে। বেজায় অস্বস্তি লাগে আমার।

প্রতিযোগিতা ব্যাপারটা সত্যিই মোটে পছন্দ করি না আমি। ওর সঙ্গে যেন অনিবার্য জড়িয়ে আছে রক্তের মত কিছু ক্ষার, মাছির চোখের মত মৃত সতর্কতা আর ধুলো কাদা মাটির পর্যাপ্ত নোংরামি, বিষয়টা আমি চিন্তা করি এভাবে: প্রতিযোগিতা মানে অবশ্যই একটা প্রতিপক্ষ এবং সেও নিশ্চয় আমার মত কেউ, কোন মানুষ। তার কাছে যদি হেরে যাই আমি তাহলে নিজের ব্যর্থতায় কষ্ট পাব। হয়ত লজ্জাও। কিংবা ফের রাগও হতে পারে। আর যদি জিতে যাই, তাহলে যে হারছে সেও মানুষ। একজন মানুষের পরাজয় বা ব্যর্থতা কি মানুষ হিসেবে আমাকেও ম্লান করবে না কিছুটা! তাহলে? কষ্ট অশান্তি রাগ অপমান লজ্জা—সমস্ত প্রতিযোগিতার শেষ পরিণাম এই। জেনেশুনে তবে আর সে আবর্জনা ঘাঁটতে যাব কেন!

বিজলী কিন্তু ওর ধারাল ঠোঁটের এক ফুৎকারে নস্যাৎ করে দেয় আমার সমস্ত যুক্তি। বলে—ওটা কোন পুরুষ মানুষের কথা হল না। নিজের পরাজয় সম্পর্কে যারা সুনিশ্চিত, দুর্বল—মনোরম কথা দিয়ে তারা এভাবে নিজের দুর্বলতা আড়াল করতে চায়।

তর্ক আর অশান্তি এড়াতে আমি প্রতিবাদ করি না। কিন্তু মন জানে, মনে মনে আমি কতখানি ঘেন্না করি প্রতিযোগিতাকে। আজও তাই ফিরে প্রশ্ন করি ওকে—এর মধ্যে আবার তুমি প্রতিযোগিতা কিংবা রেষারেষির কী দেখলে? কিন্তু তাতে আরও রহস্য গাঢ় হয়ে ওঠে। ঘনিষ্ঠ গলায় বলে—জানি গো জানি, আমি কি কিছু বুঝতে পারি না ভাবো! পাকলকে ওরা যেভাবে ছাড়িয়ে নিল। রাগ

ত হওয়ার কথা। পাঁচিলের ওপারে একটা ফ্ল্যাটের দিকে ভুরুটান ঈর্ষা হানে সে। নষ্ট ক্ষত এক পুরনো ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে দেয় যেন।

পারুল বলে একটা মেয়ে আগে কাজ করত আমাদের বাড়ি। তখনও ওপারের সবগুলো ফ্ল্যাটে মানুষের বসবাস শুরু হয় নি। কিছুদিনের মধ্যে ওরা আসতে লাগল একে একে। তখন পারুল ওখানেও কাজ নিল এক বাড়িতে। সেখানে মাইনে কিছু বেশি, আমাদেরটা কম। আমাকে বেরোতে হয় সকাল সকাল। পারুল তাই আগে আমাদের কাজ সারে, তারপর ওদের। ও বাড়িতে কাজ ধরার সময় নাকি এরকমই বলে কয়ে নিয়েছিল সে, কিন্তু মানুষের অধিকারবোধের ধারণাটা যেন জলের ওপর তেলের ফোঁটার মত। ক্রমশই ছড়িয়ে নিজের পরিধি বিস্তার করে। ফ্ল্যাটের বৌটিকেও দেখতাম সকাল হলেই তার মন উদাস করা উপস্থিতি নিয়ে এসে দাঁড়াত ব্যালকনিতে। কোমরের ওপর থেকে আধখানা শরীর লুব্ধক আলোর মত আমাদের বাড়ির দিকে ঝুঁকিয়ে সাড়া দিত—ও পারুল, কই হল তোমার!

প্রথম প্রথম এই ডাক আসত পারুল যখন হয়ত আমাদের বাড়িতে কাজকর্ম সেরে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। কিন্তু দিন দিন সময় পিছোতে লাগল। কখনও ঘর মোছার আগে, কখনও বাসন মাজার মাঝপথে—শেষে একসময় শুরু হল সে এসে আমাদের বাড়িতে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বিজলী বিরক্ত হয়, কিন্তু বলতে পারে না কিছু। আর পারুলও জানে যে ওদের ওখানে মাইনে বেশি। আমাদের কাজগুলো তাই নামকাওয়াস্তে তালিম দিয়ে তাড়াতাড়ি ছোটে ওদের মন রাখতে। কোনদিন বাসনে সকড়ির ক্ষত, কোনদিন খাটের তলায় বাসি ময়লা, শেষে একদিন অসন্তুষ্ট বিজলী বলতে বাধ্য হল—স্থাখো পারুল, কাজ নিয়ে হেলা ফেলা ভাল লাগে না আমার। তোমার না পোষালে বল, কাজ ছেড়ে দাও না হয়।

কাজ ছাড়ার ইচ্ছা বোধহয় পারুলের ছিল না। বিব্রত মুখে জানাল বৌদি, আমরা গরিব মানুষ। পেটের দায়ে গতর খাটাই। তোমরা পুরোনো বাড়ি, কাজ ছাড়ার কথা মনে করি না। কিন্তু যেখেনে দুটো পয়সা বেশি সেখেনটাও ত দেখতি হয়। এক কাজ কর তুমি, গোটা কুড়ি টাকা মাইনে বেইড়ে দাও। ওই ফেলাটের কাজ ছেড়ে দিচ্ছি তাহলি।

মাসে কুড়িটা টাকা কিছু কম নয় আমাদের কাছে। আমার ত কোনও সরকারি চাকরি বা নির্দিষ্ট আয়ের মাসিক বৃত্তি নেই। কিন্তু ফ্ল্যাটের ওরা সরকারি অফিসার। আমার এক রসিক বন্ধুর ভাষায়—নট আউট ব্যাটসম্যান। নিজেরা না চাইলে আটান্নর আগে আউট নেই ওদের। রানের জন্যেও ছোটাছুটির দরকার নেই। উইকেট, মানে চেয়ার আঁকড়ে বসে থাকলেই হল। রান, অর্থাৎ মাইনে বছর বছর এমনিতেই বাড়বে—ইয়ারলি ইনক্রিমেণ্ট। এছাড়াও আছে এক্সট্রা, মানে ডি.এ.। ব্যারোমিটারের মত ডি.এ. মিটার বসানো আছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়লে ধরা পড়ে তাতে। সেই অনুযায়ী ডি.এ. যোগ হয় মাইনেতে।

সেই রসিক বন্ধুটি আরও বলে—আমরা, অর্থাৎ আমাদের যাদের সরকারি চাকরি বা নির্দিষ্ট কোনও মাসিক আয়ের বৃত্তি নেই, যারা দেশের জনগণ—তারা হলাম ছাগলের সেজো ছেলে। ছাগলের বাঁট দুটো। দুটো ছানা দুধ খায় আর তৃতীয় ছানাটা তাই স্থাখে আর নেচে কুঁদে মানুষ হয়। আমরাও তাই করি। বাড়তি ডি. এ. নিয়ে সরকারি বাবুরা বাজারে যায়। বাজার করে। আমরা দেখি আর জলে পুড়ে মরি। জিনিস পত্রের দাম বাড়ার তাত আমাদেরও বাজে। কিন্তু যাদের মাইনে বলে কিছু নেই তাদের ডি. এ.র আব্দার শোনে কে!

সুতরাং পারুলের কথা মত সেদিন কুড়ি টাকা মাইনে বাড়ান সম্ভব হল না আমাদের পক্ষে। আমাদের বাড়িতে কাজ ছেড়ে দিয়ে পারুল পুরোপুরি লেগে গেল ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে। কিন্তু কুড়িটা টাকা বেশি দিয়ে পারুলকে সেদিন ওদের ওখান থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলেই যেন খুশি হত বিজলী। সেই খুশির ঝিলিক আজ লক্ষ করি তার চোখে মুখে। শোনায়—ফ্ল্যাটের ওই বৌটা সেদিন কী বলছিল জানো! আমি কলতলায় বসে বাসন মাজছি, তখন ওপর থেকে জিগ্যেস করল, আজ বুঝি আপনার কাজের লোক আসে নি? কতদিন একা একহাতে করছি সব, দেখতে পাচ্ছে চোখের ওপর। তবু এমন ন্যাকামির কোনও মানে হয়, বল!

—সত্যিই ত! সায় দিই আমি—পারুল যে আমাদের বাড়িতে কাজ ছেড়ে দিয়েছে তা ওঁর জানা উচিত। পারুল বলেছে নিশ্চয়।

—সে পারুলও এখন আর ওদের ওখানে কাজ করে না, তা জানো!

—তাই নাকি! কেন, কী হল আবার?

—তাকে সেই পুজোর আগে ছাড়িয়ে দিয়েছে। কাজকর্ম পছন্দ হচ্ছিল না নাকি। ওটা আসলে ছুতো। পুজোর সময় থাকলে নতুন জামাকাপড় দিতে হত। বখশিস চাই ত। খরচ বাঁচানোর জন্যে তাই আগেভাগে বিদায় করে দিয়েছে। এখন আবার অন্য লোকের ধান্দা করছে। লক্ষ্মীকে শুনিয়ে রেখেছে এক শ টাকা দেবে। কত্ত চালু! তুমি অবশ্য চালটা দারুণ দিয়েছ। আর যাই হোক, ওরা নিশ্চয় খাওয়ার কথা বলবে না। নাকি বল!

চাল শব্দটা আবার খচখচ করে আমার কানে বাজে। মানে কী শব্দটার—ফন্দি, কৌশল? বাংলা শব্দ সম্পর্কে আমার যা ধারণা তাতে মানেটা যেন ওই দিকেই যায়। প্রতিপক্ষকে জব্দ নাকাল বা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কোন সচেতন পরিকল্পনা। কিন্তু কে আমার প্রতিপক্ষ? বেস্পতিকে খেতে বলার মধ্যে আমার তেমন কোন সচেতন কৌশল বা ফন্দি কি সত্যিই আছে?

নিজের মনের অন্ধিসন্ধি তোলপাড় করেও কোন সদুত্তর মেলে না। কেমন বেকুব আর বিমূঢ় মনে হয় নিজেকে। বিজলী অবশ্য আমার মনোভাব লক্ষ করে না। চাপা খুশি নিয়ে লুডোর ঘর গুছোয়, ঘুটিগুলো সাজিয়ে তোলে। শোনায়—বেলা গেল প্রায়। কলতলায় এঁটো বাসন পড়ে আছে—আজ টিভিতে ভাল সিনেমা আছে কিন্তু—তাপস মহুয়ার, দেখবে ত?

তারপর আমার জবাবের অপেক্ষা করে না আর। উঠে চলে যায় ওদিকে।

দুপুরের খেলাটা আমাদের জমল না তেমন। খেলার প্রায় শুরুতেই লক্ষ্মী এল বেস্পতিকে নিয়ে। তারপর সে চলে গেল যেন বিজলীকে খেলার চেয়ে অন্য এক গূঢ় উত্তেজনার স্বাদ দিয়ে। সন্ধ্যের দিকে টিভির সামনে বসেছিলাম আমরা। কিন্তু সিনেমাটা ঠিক জমে ওঠার মুখেই আচমকা লোডশেডিং হয়ে গেল!

ফ্ল্যাটের ওদের জেনারেটার আছে। লোডশেডিং হলেও অসুবিধে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল আবার। টিভিও চলতে শুরু করল। কিন্তু আমাদের এপারে তখন আলোকিত হারিকেনের অন্ধকার। আমাদের ঘরে তখন বোবা টিভি। ওদের ফ্ল্যাটে টিভি চলে। তাপস মহুয়ার অস্পষ্ট কথাবার্তা যেন অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলে বিজলীর। ওদের জেনারেটারের শব্দ হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিশেল খেয়ে যেন রক্তে ঝাল ছড়িয়ে যায় তার। বলে—সারাক্ষণ কানের ওপর এই ঢিব্ ঢিব্ জালিয়ে মারল একেবারে।

তাকে ভোলানোর জন্যেই তখন প্রস্তাব দিই—ওবেলা খেলাটা ত শেষ হল না। এখন হবে নাকি?

ভারি খুশি হয় সে। প্রায়, সঙ্গে সঙ্গে ছক পেতে ঘুটি সাজিয়ে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু খেলতে খেলতে আবার একসময় টেনে আনে বেস্পতির প্রসঙ্গ। জানতে চায়—আচ্ছা, কী মনে হয় তোমার, ফ্ল্যাটের ওরাও কি খাওয়ার কথা বলতে পারে মেয়েটাকে?

শুনে হেসে ফেলি। বলি—আশ্চর্য, তুমি এই নিয়ে এখনও তোলপাড় করছ মনে মনে? পারো বটে!

—না না, বল না, কী মনে হয় তোমার? ওরাও খাওয়ার কথা বলতে পারে?

—বলবে, বলবে। সহজভাবেই বলি—লক্ষ্মীর পছন্দ হলে সে তার বোনঝিকে কাজ করতে দেবে ওদের বাড়িতে। আমাদের কী যায় আসে তাতে, ওছাড়া আর কাজের লোক মিলবে না নাকি!

—লোক হয়ত মিলবে, কিন্তু আবার তাহলে ওরা টেক্কা দিয়ে যাবে আমাদের ওপর।

চমকে তাকাই বিজলীর মুখের দিকে। অসম্ভব জেদি আর গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় না। তবুও মনে হয় খুব তীক্ষ্ণ আর শানিত তার তাকানোর ভঙ্গি। ছক্কা ঝাঁকিয়ে দান ফেলে, ঘুটিতে চাল দেয়, টিপে টিপে। কিন্তু ঘুটি যেন তখন আর ঘুটি নেই তার হাতে, মনের তীব্র ইচ্ছা আর প্রবল জেদের রূপ নিয়েছে। এমনভাবে টিপের চাপ দেয় যে প্লাস্টিকের পাতলা চাকতিটা বুঝি ভেঙে যাবে কখন।

শান্ত করতে চেষ্টা করি ওকে। বলি—এই সামান্য ব্যাপারটাকে তুমি এমন জেদের বিষয় করে তুলছ কেন! আমি কিন্তু কোন জেদ বজায় রাখতে বা ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কথা মনে করে খাওয়ার প্রস্তাব দিই নি মেয়েটাকে।

—তাহলে! তুমুল বিস্ময়ে আলোড়িত হয় সে—খালি কি মুখ দেখেই তখন বললে ওকথা!

—মুখ! হ্যাঁ, তা বলতে পার। নাহলে ধর মেয়েটার চোখ, তার শরীর···

—হেঁয়ালি কোরো না ত। কী বলতে চাও সোজাসুজি বল। বিজলী ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—মেয়েটা এসে কীভাবে জল খাচ্ছিল দেখলে না তখন! খুব খিদে পেয়েছিল বোধহয়। তাছাড়া কেমন রোগা শুকনো চেহারা, বাড়িতে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া হয় না। লক্ষ্মীর কাছে শুনলে ত সবকথা।

তাই বিস্ময়ে যেন হতভম্ব হয়ে যায় বিজলী। বিস্ময় কিংবা সন্দেহ। দু'চোখের রঞ্জন রশ্মি দিয়ে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে আমাকে। কথাগুলো বিশ্বাস করতে বুঝি কষ্ট হয় তার। ফের হয়ত বিশ্বাস করে একসময়। তখন তিতো আর বিষাক্ত হয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর—খালি ওই জন্যেই তুমি খাওয়ার নেমন্তন্ন দিলে ওকে! কেন, আমাদের বাড়িটা কি কোনও সরকারি ডোল, নাকি মানুষের শরীর সারানোর জায়গা।

অপ্রস্তুত হাসার চেষ্টা করি। বলি—এই স্থাখো, তুমি আবার রেগে যাচ্ছ বোধহয়।

—হেসো না ত। দেখলে আমার গা জ্বালা করে। একজন লোককে খাওয়াতে মাসে কত খরচ পড়ে হিসেব করেছ?

—হিসেব হয়ত করি নি। কিন্তু তখন ত তুমি কেমন তারিফ করেছিলে আমার প্রস্তাবটাকে।

—তখন না হয় বুঝেছিলাম একটা উদ্দেশ্য ছিল তবু।

উদ্দেশ্য! আবার যেন কেমন গোলমালে পড়ে যাই ওই শব্দটা নিয়ে। কিসের উদ্দেশ্য—প্রতিযোগিতার, টক্করের? মানুষের সমৃহ উদ্দেশ্যের মূল লক্ষ্য কি তবে এই? এবং এর জন্যে কোনও খরচের বরাদ্দ হিসেব না করলেও চলে! বেজায় দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই যেন। তবে যে শুনি মানুষ সামাজিক জীব, পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতায় সবার বেঁচে থাকাটা সহজ ও সচ্ছন্দ করার উদ্দেশ্যে সমাজ গঠন করেছে সে, সমাজে বাস করে! তাহলে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা এমন মুখ্য হয়ে ওঠে কী করে? কোনরকম প্রতিযোগিতার মধ্যে না গিয়ে শুধু নিজের ভাল লাগে বলে কিংবা অন্য কারও কিছু ভাল হবে বলে হিসেবের কথা চিন্তা না করে সে কি কিছু করতে পারে না! স্রেফ ভাল লাগা কিংবা ভাল হওয়াটা কি কোনও উদ্দেশ্য হতে পারে না?

এসব জিজ্ঞাসাই আমূল তোলপাড় করে আমাকে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না। বিজলীর চোখমুখ কেমন গম্ভীর আর থমথমে হয়ে উঠেছে। কথার সঙ্গে গলার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে কান্না কিংবা দুরন্ত অভিমান—টাকা উপার্জন কর তুমি। তাই মনে কর যা খুশি, যে-কোনও উটকো দায়-দায়িত্ব তুমি চাপিয়ে দিতে পার আমার ওপর। এজন্যে আমাকে একটা কথাও জিগ্যেস করার প্রয়োজন মনে কর না তুমি। কিন্তু ক'টাকা আন বাড়িতে, তাতে কীভাবে চালাতে হয় আমাকে, কত কষ্টে—তা তুমি একটুও ভাব না।

প্রবল প্রতিপক্ষের মত রুক্ষ আর আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে সে। বড় বিব্রত আর অসহায় মনে হয় নিজেকে। আত্ম-রক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি বলি—আচ্ছা, এসব নিয়ে তুমি এক্ষুণি এত মাথা গরম করছ কেন! এমনও ত হতে পারে যে আমরা খাওয়ার কথা বলেছি শুনে ফ্ল্যাটের ওরাও খাওয়ার কথা বলল মেয়েটাকে, মাইনেও কিছু বেশি—

—হ্যাঁ, ওরা তোমার মত বোকা কিনা! দয়া উথাল পাথাল করছে বুকে। একজন লোক দিনে একবার খেলেও মাসে কম করে দেড়শ টাকা। জামা কাপড় দেওয়ার ভয়ে যারা আগে থেকে হিসেব করে পুজোর আগে লোক ছাড়িয়ে দেয়, ওই পুঁচকে মেয়েটার জন্যে তারা বাক্স উপুড় করে দেবে!

একটু ভাবতে হয়। মনে মনে যুক্তি সাজিয়ে ফের বলি—বেস্পতির মাও ত খাওয়ার প্রস্তাবে রাজি না হতে পারে!

—তারাও তোমার মত বেহিসেবী নয়। একবেলা খেতে পাওয়াটা কিছু কম নাকি? ছাড়বে কেন?

—তাহলে ত ভালই হল, বেস্পতি পার্মানেন্টলি থেকে যাবে আমাদের বাড়িতে—

—বেস্পতি নয়, থাকবে একটা পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি আর থাকবে তোমার—। কী একটা শক্ত কথা বলতে গিয়ে যেন জিভ কামড়ে কোনরকমে নিজেকে সামলে নেয় বিজলী। পাছে আমার দিকে তাকালে আর রাগ সামলাতে না পারে, তাই প্রবল বিরাগে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় অন্যদিকে।

তাকাই আমিও—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে। আমার মহৎ ইচ্ছার সমর্থনে কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। মনে হয় যেন পতন অনিবার্য এক গভীর অন্ধকার খাদের কিনারায় এসে পড়েছি হঠাৎ। পাশ কাটানোর কোনও উপায় নেই। ব্যাপারটা ভোলার জন্যে আপাতত খেলায় মনোযোগী হই। কিন্তু ছক্কা তুলে চাল দিতে গিয়ে থমকে যাই, চমকে উঠি। আমার সবুজ ঘুটি হ্যারিকেনের আলোয় কেমন নীলচে অচেনা হয়ে গেছে। ঘুটিটা যে ঘরে থেমে আছে তার পরের ঘরেই লম্বা একটা সাপের মুখ, একঘর ছেড়ে আবার একটা। কোনও বিপাকে যদি এক কিংবা তিন পড়ে তাহলে সাপের

মুখ বরাবর আমাকে নেমে চলে আসতে হবে নিচে। বিজলীর লাল ঘুটি যা এখন আমার অনেক পিছনে, একটুও না এগিয়ে তা তখন আমার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

ছক্কাটা তুলে নিয়ে নাড়া দিই, নাড়া দিই। কিন্তু দান ফেলতে সাহস হয় না। আগের প্রশ্নে ফিরে আসি আবার। বিজলীকে বলি—বেশ ত, খাওয়ার কথা বলায় যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এবার এলে বলে দিও যে খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।

আরও বিরক্ত হয় বিজলী—তাই বলা যায় নাকি। একবার একটা কথা বলে আবার ফিরিয়ে নেওয়া—কী মনে করবে ওরা, তারপর লোকের কাছে যখন এসব নিয়ে গল্প করবে তখন—

অসহ্য বিরক্তি জাগে নিজের ওপর। বলি—তাহলে সোজাসুজি জানিয়ে দিও যে লোক লাগবে না।

—তাই বা কী করে বলব! একজন লোকের ত সত্যিই দরকার আমাদের। কত দিন ধরে বলছি লক্ষ্মীকে। বলতে গেলে আমিই তাগাদা দিয়ে দিয়ে আনিয়েছি ওর বোন-ঝিকে। এত কথাবার্তার পর এখন হঠাৎ—

একটু থামে বিজলী, কী যেন ভেবে নেয় খানিক। বলে—তবে হ্যাঁ, এক যদি করা যায় যে ও আমার আগেই দুএকদিনের মধ্যে অন্য একজন কাজের লোক যোগাড় করে নিতে পারি আমরা, তখন বলা যায় যে তোমাদের আসতে দেরি হচ্ছিল, তাই—

অবাক বিস্ময়ে তাকাই বিজলীর মুখের দিকে। আমূল অচেনা মনে হয় ওকে। চোখ ঘুরিয়ে লুডোর ছকের দিকে তাকাই। গভীর অন্ধকারময় সাপের হাঁ-মুখ থেকে আমার বিবর্ণ ঘুটিটাকে বাঁচানোর যেন দিশা মেলে একটা। পো বা এক ফেলে গতানুগতিক কদম কদম নয়—উড়োলাফ দিতে হবে, এবং তা করতে গেলে এতক্ষণ যেভাবে সোজাসুজি চাল দিয়েছি সেভাবে চলবে না, ঘুরিয়ে চাল দিয়ে চেষ্টা করতে হবে এই সর্পিল বিড়ম্বনা টপকে যাওয়া যায় কিনা। মনে মনে কেমন উত্তেজনা জাগে আমার, একটু বিরক্তির খিচ। ছক্কাটাকে বার কয়েক ঝাঁকিয়ে হাত বাঁকিয়ে উপুড় করে দিই এবং তা গড়াতে গড়াতে কিছুটা গিয়ে শেষে পাল্লা হয়ে পড়ে। ঘর গুণে পাঁচ ঘর এগিয়ে গিয়ে আবার এক চমক—একটা সিঁড়ির তলায় পৌঁছে গেছি আমি—অর্থাৎ আমি কিংবা আমার ঘুটিটা মওকা সুযোগ পেয়ে গেল আরও কিছুটা এগোনোর।

বিজলী জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ তাকাল আমার দিকে। তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল—তাই করতে হবে, বুঝেছ! দুএকদিনের মধ্যে অন্য একজনকে যোগাড় করতেই হবে কোনরকমে। তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের বল, আমিও দেখছি এদিকে···।

বলতে বলতে কারেন্ট আসে, আলো জ্বলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে ওঠে সে—এ কী, এত রাত হয়ে গেছে! ওঠো ওঠো, আর খেলে না। উঠে খাওয়াদাওয়া সেরে নাও। কাল আবার বেরোবে তুমি। সকালে উঠে রান্নাবান্না—শুতে রাত হলে সময় মত উঠতে পারব না।

ঘর গুটিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় সে।

সেদিনের রাতটা গেল। কিন্তু তারপর থেকে দিন-গুলোও আসতে লাগল যেন সেই রাতের অন্ধকার ধারা-বাহিকতা বয়ে। অসম্ভব উত্তেজনা আর স্নায়ুতাড়নার সেই দিনগুলো। বিজলীর সব সময় আতঙ্ক এই বুঝি বেস্পতিকে নিয়ে এসে পড়ল লক্ষ্মী, খাওয়ার শর্ত মেনেই কাজ আরম্ভ করে দিল। চেনা জানা বন্ধু বান্ধব কিংবা পাড়ার অনেককে সে জানিয়ে দিল যে একজন কাজের লোক আমাদের নীগগির দরকার। তেমন খোঁজ খবর কেউ পেলে কিংবা যে-যার সাধ্যমত সন্ধান নিয়ে আমাদের জানায় যেন।

সকালে উঠে আমি কাজে যাই, কিন্তু তা যেন আমার কাজে যাওয়া নয়—বিজলীর জন্যে কাজের লোকের সন্ধানে বেরোনো। বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে ফি-দিন নিয়ম করে সামনে এসে দাঁড়ায়, স্মরণ করিয়ে দেয় সেদিন কার কার কাছে খোঁজ নেওয়ার কথা, সম্ভব হলে আরও কার কার সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে হবে। বাড়িতে ফিরে তার মুখোমুখি হলেই প্রথম জিজ্ঞাসা—কী গো, ব্যবস্থা হল কিছু, যোগাড় করতে পারলে কাউকে? মুখ দেখেই সম্ভবত জবাবটা আন্দাজ করে নেয় সে। গাঢ় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় টলমল করে—কী হবে বলো ত! এতদিন লক্ষ্মী আসেনি, কিন্তু কাল হয়ত ঠিক এসে পড়বে। উঃ, কী কুক্ষণে যে সেদিন কথা বলতে বলেছিলাম তোমাকে। নাহলে আজ হয়ত এমন টেনশনে পড়তে হত না।

মুখ বুঁজে ধিকার সহ্য করি তার। কখনও আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করি—আজ আবার বলেছি কজনকে। ভরসা পেয়েছি খানিকটা। দেখি কাল হয়ত—

বিজলী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জানতে চায় কাকে কী

—মেয়েটা এসে কীভাবে জল খাচ্ছিল দেখলে না তখন! খুব খিদে পেয়েছিল বোধহয়। তাছাড়া কেমন রোগা শুকনো চেহারা, বাড়িতে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া হয় না। লক্ষ্মীর কাছে শুনলে ত সবকথা।

তাই বিস্ময়ে যেন হতভম্ব হয়ে যায় বিজলী। বিস্ময় কিংবা সন্দেহ। দু'চোখের রঞ্জন রশ্মি দিয়ে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে আমাকে। কথাগুলো বিশ্বাস করতে বুঝি কষ্ট হয় তার। ফের হয়ত বিশ্বাস করে একসময়। তখন তিতো আর বিষাক্ত হয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর—খালি ওই জন্যেই তুমি খাওয়ার নেমন্তন্ন দিলে ওকে! কেন, আমাদের বাড়িটা কি কোনও সরকারি ডোল, নাকি মানুষের শরীর সারানোর জায়গা।

অপ্রস্তুত হাসার চেষ্টা করি। বলি—এই আখো, তুমি আবার রেগে যাচ্ছ বোধহয়।

—হেসো না ত। দেখলে আমার গা জ্বালা করে। একজন লোককে খাওয়াতে মাসে কত খরচ পড়ে হিসেব করেছ?

—হিসেব হয়ত করি নি। কিন্তু তখন ত তুমি কেমন তারিফ করেছিলে আমার প্রস্তাবটাকে।

—তখন না হয় বুঝেছিলাম একটা উদ্দেশ্য ছিল তবু।

উদ্দেশ্য! আবার যেন কেমন গোলমালে পড়ে যাই ওই শব্দটা নিয়ে। কিসের উদ্দেশ্য—প্রতিযোগিতার, টক্করের? মানুষের সমূহ উদ্দেশ্যের মূল লক্ষ্য কি তবে এই? এবং এর জন্যে কোনও খরচের বরাদ্দ হিসেব না করলেও চলে! বেজায় ধন্দের মধ্যে পড়ে যাই যেন। তবে যে শুনি মানুষ সামাজিক জীব, পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতায় সবার বেঁচে থাকাটা সহজ ও সচ্ছন্দ করার উদ্দেশ্যে সমাজ গঠন করেছে সে, সমাজে বাস করে! তাহলে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা এমন মুখ্য হয়ে ওঠে কী করে? কোনরকম প্রতিযোগিতার মধ্যে না গিয়ে শুধু নিজের ভাল লাগে বলে কিংবা অন্য কারও কিছু ভাল হবে বলে হিসেবের কথা চিন্তা না করে সে কি কিছু করতে পারে না! স্রেফ ভাল লাগা কিংবা ভাল হওয়াটা কি কোনও উদ্দেশ্য হতে পারে না?

এসব জিজ্ঞাসাই আমূল তোলপাড় করে আমাকে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না। বিজলীর চোখমুখ কেমন গম্ভীর আর থমথমে হয়ে উঠেছে। কথার সঙ্গে গলার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে কান্না কিংবা দুরন্ত অভিমান—টাকা উপার্জন কর তুমি। তাই মনে কর যা খুশি, যে-কোনও উটকো দায়-দায়িত্ব তুমি চাপিয়ে দিতে পার আমার ওপর। এজন্যে আমাকে একটা কথাও জিগ্যেস করার প্রয়োজন মনে কর না তুমি। কিন্তু ক'টাকা আন বাড়িতে, তাতে কীভাবে চালাতে হয় আমাকে, কত কষ্টে—তা তুমি একটুও ভাব না।

প্রবল প্রতিপক্ষের মত রুক্ষ আর আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে সে। বড় বিব্রত আর অসহায় মনে হয় নিজেকে। আত্মরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি বলি—আচ্ছা, এসব নিয়ে তুমি এক্ষুণি এত মাথা গরম করছ কেন! এমনও ত হতে পারে যে আমরা খাওয়ার কথা বলেছি শুনে ফ্ল্যাটের ওরাও খাওয়ার কথা বলল মেয়েটাকে, মাইনেও কিছু বেশি—

—হ্যাঁ, ওরা তোমার মত বোকা কিনা! দয়া উথাল পাথাল করছে বুকে। একজন লোক দিনে একবার খেলেও মাসে কম করে দেড়শ টাকা। জামা কাপড় দেওয়ার ভয়ে যারা আগে থেকে হিসেব করে পুজোর আগে লোক ছাড়িয়ে দেয়, ওই পুঁচকে মেয়েটার জন্যে তারা বাক্স উপুড় করে দেবে!

একটু ভাবতে হয়। মনে মনে যুক্তি সাজিয়ে ফের বলি—বেস্পতির মাও ত খাওয়ার প্রস্তাবে রাজি না হতে পারে!

—তারাও তোমার মত বেহিসেবী নয়। একবেলা খেতে পাওয়াটা কিছু কম নাকি? ছাড়বে কেন?

—তাহলে ত ভালই হল, বেস্পতি পার্মানেন্টলি থেকে যাবে আমাদের বাড়িতে—

—বেস্পতি নয়, থাকবে একটা পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি আর থাকবে তোমার—। কী একটা শক্ত কথা বলতে গিয়ে যেন জিভ কামড়ে কোনরকমে নিজেকে সামলে নেয় বিজলী। পাছে আমার দিকে তাকালে আর রাগ সামলাতে না পারে, তাই প্রবল বিরাগে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় অন্যদিকে।

তাকাই আমিও—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে। আমার মহৎ ইচ্ছার সমর্থনে কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। মনে হয় যেন পতন অনিবার্য এক গভীর অন্ধকার খাদের কিনারায় এসে পড়েছি হঠাৎ। পাশ কাটানোর কোনও উপায় নেই। ব্যাপারটা ভোলার জন্যে আপাতত খেলায় মনোযোগী হই। কিন্তু ছক্কা তুলে চাল দিতে গিয়ে থমকে যাই, চমকে উঠি। আমার সবুজ ঘুটি হ্যারিকেনের আলোয় কেমন নীলচে অচেনা হয়ে গেছে। ঘুটিটা যে ঘরে থেমে আছে তার পরের ঘরেই লম্বা একটা সাপের মুখ, একঘর ছেড়ে আবার একটা। কোনও বিপাকে যদি এক কিংবা তিন পড়ে তাহলে সাপের

মুখ বরাবর আমাকে নেমে চলে আসতে হবে নিচে। বিজলীর লাল ঘুটি যা এখন আমার অনেক পিছনে, একটুও না এগিয়ে তা তখন আমার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

ছক্কাটা তুলে নিয়ে নাড়া দিই, নাড়া দিই। কিন্তু দান ফেলতে সাহস হয় না। আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার। বিজলীকে বলি—বেশ ত, খাওয়ার কথা বলায় যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এবার এলে বলে দিও যে খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।

আরও বিরক্ত হয় বিজলী—তাই বলা যায় নাকি। একবার একটা কথা বলে আবার ফিরিয়ে নেওয়া—কী মনে করবে ওরা, তারপর লোকের কাছে যখন এসব নিয়ে গল্প করবে তখন—

অসহ্য বিরক্তি জাগে নিজের ওপর। বলি—তাহলে সোজাসুজি জানিয়ে দিও যে লোক লাগবে না।

—তাই বা কী করে বলব! একজন লোকের ত সত্যিই দরকার আমাদের। কত দিন ধরে বলছি লক্ষ্মীকে। বলতে গেলে আমিই তাগাদা দিয়ে দিয়ে আনিয়েছি ওর বোনঝিকে। এত কথাবার্তার পর এখন হঠাৎ—

একটু থামে বিজলী, কী যেন ভেবে নেয় খানিক। বলে—তবে হ্যাঁ, এক যদি করা যায় যে ও আমার আগেই দুএকদিনের মধ্যে অন্য একজন কাজের লোক যোগাড় করে নিতে পারি আমরা, তখন বলা যায় যে তোমাদের আসতে দেরি হচ্ছিল, তাই—

অবাক বিস্ময়ে তাকাই বিজলীর মুখের দিকে। আমূল অচেনা মনে হয় ওকে। চোখ ঘুরিয়ে লুডোর ছকের দিকে তাকাই। গভীর অন্ধকারময় সাপের হাঁ-মুখ থেকে আমার বিবর্ণ ঘুটিটাকে বাঁচানোর যেন দিশা মেলে একটা। পো বা এক ফেলে গতাগুগতিক কদম কদম নয়—উড়োলাফ দিতে হবে, এবং তা করতে গেলে এতক্ষণ যেভাবে সোজাসুজি চাল দিয়েছি সেভাবে চলবে না, ঘুরিয়ে চাল দিয়ে চেষ্টা করতে হবে এই সর্ষিল বিড়ম্বনা টপকে যাওয়া যায় কিনা। মনে মনে কেমন উত্তেজনা জাগে আমার, একটু বিরক্তির খিচ। ছক্কাটাকে বার কয়েক ঝাঁকিয়ে হাত বাঁকিয়ে উপুড় করে দিই এবং তা গড়াতে গড়াতে কিছুটা গিয়ে শেষে পাক্কা হয়ে পড়ে। ঘর গুণে পাঁচ ঘর এগিয়ে গিয়ে আবার এক চমক—একটা সিঁড়ির তলায় পৌঁছে গেছি আমি—অর্থাৎ আমি কিংবা আমার ঘুটিটা মওকা সুযোগ পেয়ে গেল আরও কিছুটা এগোনোর।

বিজলী জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ তাকাল আমার দিকে। তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল—তাই করতে হবে, বুঝেছ! দুএকদিনের মধ্যে অন্য একজনকে যোগাড় করতেই হবে কোনরকমে। তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের বল, আমিও দেখছি এদিকে···।

বলতে বলতে কারেন্ট আসে, আলো জ্বলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে ওঠে সে—এ কী, এত রাত হয়ে গেছে! ওঠো ওঠো, আর খেলে না। উঠে খাওয়াদাওয়া সেরে নাও। কাল আবার বেরোবে তুমি। সকালে উঠে রান্নাবান্না—শুতে রাত হলে সময় মত উঠতে পারব না।

ঘর গুটিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় সে।

সেদিনের রাতটা গেল। কিন্তু তারপর থেকে দিনগুলোও আসতে লাগল যেন সেই রাতের অন্ধকার ধারাবাহিকতা বয়ে। অসম্ভব উত্তেজনা আর আত্মতাড়নার সেই দিনগুলো। বিজলীর সব সময় আতঙ্ক এই বুঝি বেস্পতিকে নিয়ে এসে পড়ল লক্ষ্মী, খাওয়ার শর্ত মেনেই কাজ আরম্ভ করে দিল। চেনা জানা বন্ধু বান্ধব কিংবা পাড়ার অনেককে সে জানিয়ে দিল যে একজন কাজের লোক আমাদের সীরিয়াস দরকার। তেমন খোঁজ খবর কেউ পেলে কিংবা যে-যার সাধ্যমত সন্ধান নিয়ে আমাদের জানায় যেন।

সকালে উঠে আমি কাজে যাই, কিন্তু তা যেন আমার কাজে যাওয়া নয়—বিজলীর জন্যে কাজের লোকের সন্ধানে বেরোনো। বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে ফি-দিন নিয়ম করে সামনে এসে দাঁড়ায়, স্মরণ করিয়ে দেয় সেদিন কার কার কাছে খোঁজ নেওয়ার কথা, সম্ভব হলে আরও কার কার সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে হবে। বাড়িতে ফিরে তার মুখোমুখি হলেই প্রথম জিজ্ঞাসা—কী গো, ব্যবস্থা হল কিছু, যোগাড় করতে পারলে কাউকে? মুখ দেখেই সম্ভবত জবাবটা আন্দাজ করে নেয় সে। গাঢ় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় টলমল করে—কী হবে বলো ত! এতদিন লক্ষ্মী আসেনি, কিন্তু কাল হয়ত ঠিক এসে পড়বে। উঃ, কী কুক্ষণে যে সেদিন কথা বলতে বলেছিলাম তোমাকে। নাহলে আজ হয়ত এমন টেনশনে পড়তে হত না।

মুখ বুঁজে ধিক্কার সহ্য করি তার। কখনও আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করি—আজ আবার বলেছি কজনকে। ভরসা পেয়েছি খানিকটা। দেখি কাল হয়ত—

বিজলী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জানতে চায় কাকে কী

বলেছি, তারা কে কী ভরসা দিয়েছে। যেন এর থেকে সে আগামী কালের কল্যাকলটা অগ্রিম আন্দাজ করতে চেষ্টা করে।

গোটা ব্যাপারটাই যেন বাড়াবাড়ির মত মনে হয় আমার। মনে হয় যেন আমার একটা নিষ্পাপ সাদা ইচ্ছাকে ক্ষমাহীন বানচাল করার জন্যেই মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। কী এমন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেত বেল্পতিকে ছুটো করে খেতে দিলে! তার জন্যে বাঁকা রাস্তায় এই উর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি—মনে মনে উমা জাগে আমার। প্রথম প্রথম বিজলীর কথা মত ছুচারজনকে কাজের লোকের কথা বলি নি তা নয়। কিন্তু কারও কাছ থেকে তেমন আশাব্যঞ্জক কোন সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে ওটিয়ে নিই নিজেকে। তখন বাড়িতে ফিরে যে-সব বন্ধু বান্ধবের নাম মুখে আসে বলে দিই বিজলীকে, তাদের মুখে কাল্পনিক কথাবার্তা বসিয়ে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করি তাকে। মনে মনে এক ধরনের কৌতুক অনুভব করি। বিজলী যদি আমার ইচ্ছাকে বানচাল করার জন্যে এমন মরিয়া হয়ে উঠতে পারে, তার ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্যে আমিই বা তবে এত উদ্যোগ নিতে যাব কেন!

এই লুকোচুরি খেলায় কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেলাম শীগগির। সেদিন বাড়িতে ফিরে দেখি বিজলী অসম্ভব গম্ভীর, থমথমে। কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই পড়ে যাই তার জোরালো জেরার মুখে। জানতে চায়—ওদিন তুমি বলছিলে না, সমরবাবুকে বলেছ কাজের লোকের কথা?

—হ্যাঁ, বাজারে দেখা হল, বললাম। কেন?

ভিতরের রাগ আর বিদ্বেষ প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করে বিজলী। তবুও যেন তার তাত অনিবার্য ছিটকে আসে কিছু। বলে আজ সমরবাবু এসেছিলেন তোমার খোঁজে। বললেন যে প্রায় একমাস নাকি দেখা হয় নি তোমার সঙ্গে। কাজের লোকের ব্যাপারেও কোন কথা হয় নি কখনও।

অন্য এক সমরবাবুর দোহাই দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি ওকালতি করতে চাইছিলাম কিছু। অথবা হয়ত অসহায় ভঙ্গিতে আত্ম সমর্পণই করতে যাচ্ছিলাম বিজলীর কাছে। কিন্তু তার সুযোগ দেয় না সে। ছুচোখে তীব্র ঘৃণা আর অবজ্ঞা নিয়ে সরে যায় সামনে থেকে।

সেদিন রাতে খেতে বসেও বিজলী তেমনি গম্ভীর আর থমথমে। আমার সঙ্গে কোনরকম বাক্যালাপেই যেন বিরক্তি বোধ করে সে। অথবা কে জানে, মনে মনে তখন হয়ত সে পরিকল্পনা সাজায় কিছু—বেল্পতি এসে পড়ার আগে কীভাবে অন্ন একজনের ব্যবস্থা করে নিতে পারে নিজের উদ্যোগে। এ ব্যাপারে আমি যেন তার প্রতিযোগী, তাই মনের খবর কিছু জানাতে চায় না আমাকে। তার ভাবভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে যাই। এই কি সেই বিজলী যার রাত জাগার কষ্ট ঘুম টুটিয়ে দেয় আমার কিংবা আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে যে নিঃশ্বাসের কষ্ট বুকে নিয়ে ঘুমের ভান করে জেগে রাত কাটিয়ে দেয় বিছানায়! কেমন সন্দেহ জাগে, মনে হয় যেন একে আমি চিনি না, আগে দেখি নি কখনও। সঠিক সম্পর্ক না জেনে হাত ধরেছি, আসলে সে আমার এক তুমুল প্রতিযোগী।

খাবার যেন বিষ হয়ে যায় আমার কণ্ঠনালীতে। ভয়ঙ্কর এক জটিল আবর্তে পড়ে গেছি যেন। আমাদের এত দিনের যুগল সম্পর্ক, সংসার, স্বপ্ন—সব বুঝি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যায় কিংবা গেছে। এখন একমাত্র উপায় বেল্পতি যদি কোনও কারণে কাজে না আসে আমাদের বাড়ি। মনে মনে প্রার্থনা করি তাই যেন হয়।

বিছানায় শুয়ে প্রলয় ঘুমে ছুচোখ জলে যায়, কিন্তু ঘুম আসে না। আমুদ অচেনা এক নারীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় স্বপ্ন আসে জাগ্রত পায়ে। স্বপ্ন কিংবা সেই সাপলুডো। লুডোর ঘর পেতে বসি আমরা—আমি আর বিজলী। ছক্কা ঝাঁকিয়ে চাল দিয়ে শুরু হয় আমাদের, খেলা চলে—। চোকোর চাল, পাঞ্জার দান—কখনও সাপের মুখের অন্ধকার গহ্বর বরাবর ভয়ঙ্কর পাতাল ঝাঁপ, কখনও সিঁড়ির তলা ছুঁয়ে বেমক্কা ওপর ছুট। ইচ্ছে ঘুটিতে টিপে টিপে চাল দিয়ে এগিয়ে যাই। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিই কে কতটা এগিয়ে যাচ্ছি অন্যকে পিছনে ফেলে। সবার লক্ষ্য নিজের জন্যে সিঁড়ি কিন্তু অন্যের জন্যে সাপ। যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েও এগোনোর সুখ নেই মনে, যতক্ষণ না নিশ্চিন্ত হচ্ছি যে প্রতিপক্ষ সাপের মুখ বরাবর নামছে, নামছে এবং নামছে...। এবং যখন এভাবে নিজের এগোনোর পাশাপাশি অন্যের পিছিয়ে পড়াটাও আশাতীত সম্পন্ন হচ্ছে তখন, কেবলমাত্র তখনই মানুষের আলো আর সুর ছিটকে বেরোচ্ছে আমাদের ভিতর থেকে।

স্বপ্নে এই তীব্র খেলার মধ্যে আচমকা আমাদের কলের হাতলে উড়ে এসে বসে একটা কাক। ঘাড়ে পালক নেই তার। না, কাক নয়—আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় বেল্পতি। কঙ্কাল হাত প্রসারিত করে দেয় আমাদের দিকে।

—কী চাই, কেন এসেছিস তুই? প্রবল বিরাগে চুরমার হয় আমার কণ্ঠস্বর। খোয়া, পেরেক, কাচের ধারালো টুকরোর মত ছিটকে যাই তার দিকে। সে হাসে, নিঃশব্দে। তার কঙ্কাল হাত আরও প্রসারিত করে। লম্বা হতে হতে, হতে হতে···তা মেঁধিয়ে যায় আমার হৃৎপিণ্ডের সুদূর গভীরে। সেই হাতে প্রার্থনা জাগে—আলো দাও, সুর দাও।

আমি চিৎকার করে বলি—এ আলো আলো নয়। দেখছিস না বোকা মেয়ে এতে কোনও সুর নেই—তাই কেবলমাত্র নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না এতে। এই সুর তাও সুরও নয়—কেননা এতে কোনও আলোর বৈভব নেই, মাত্র নিজের কণ্ঠস্বর ছাড়া অন্য কিছু ধ্বনিত করতে পারে না। ফিরে যা বোকা মেয়ে, ফিরে যা—এখানে কেন এসেছিস তুই!

তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন আমার সজোর হাত এগিয়ে যায় তার দিকে। মস্তক স্পর্শ করে। তাতে সে কঙ্কাল ছাপিয়ে শরীরী হয়ে ওঠে। সেই শরীর ফের মানুষী হয়—সন্তানবতী নারী হয়—ভূমি যা শস্যশালিনী মাটি হয়—দেশ জন্মভূমি হয়—সুরের সঞ্চার হয় তাতে—নদী বয়ে যায়, মেঘ আর পাখিদের ডাকাডাকি—শিশুর ক্রন্দন—। না শিশু নয়, ভ্রূণ কিংবা তারও আগের কোন একটি এক শুক্রাণু—চারপাশের তুমুল প্রতিরোধের সঙ্গে মরিয়া প্রতিযোগিতায় সে পিচ্ছিল অন্ধকার বরাবর এগিয়ে যায় আলোক শিকারে···

তারপরে একটা কাক ডাকে—কা কা কা।

তবে কি সকাল হল! ঘুম ভেঙে যায় আমার। তখন দেখি কাল রাতের অন্ধকার মুখ নিয়ে বিজলী কৌটো মেপে চাল নিচ্ছে হাঁড়িতে। চোখাচোখি হতে অনুচ্ছাস সাড়া দেয়—লক্ষ্মী এসেছে বেল্পতিকে নিয়ে। আজ থেকে কাজে লাগতে চায়। বারান্দায় বসিয়ে রেখেছি, কী বলবে উঠে বল!

বিজলী বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। আকণ্ঠ তিতো স্বাদ নিয়ে উঠে বসি আমি। কেমন যেন রাগ হয় বেল্পতি বা লক্ষ্মীর ওপর। কেন এল ওরা! বিজলী ভয়ঙ্কর রেগে আছে এখন। এখন যদি খাওয়ার শর্ত মেনে বেল্পতি কাজে লাগতে চায় তাহলে কী বলবে সে? আমিও কি আর চোখ তুলে তাকাতে পারব তার মুখের দিকে!

গভীর দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বাইরে আসি। বারান্দায় তেমনি পা ঝুলিয়ে বসেছে লক্ষ্মী। বেল্পতি কলতলায় দাঁড়িয়ে। যেন বলা মাত্রই এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ শুরু করে দেবে সে। পরনে সেদিনের সেই সাজগোজ। কিন্তু আজ আর কোনও মায়া জাগে না তার ওপর। মনে হয় যেন খাওয়ার প্রস্তাব পেয়েছে বলেই আকণ্ঠ লোভ নিয়ে দৌড়ে এসেছে সে। দৌড়ে এসেছে আমার আর বিজলীর মসৃণ সম্পর্কে চিড় ধরাবে বলে। ঝাঁঝালো গলায় জিগ্যেস করি—কী হলো, ফ্ল্যাটের ওদের বাড়ি কাজ করবে না?

—না গো দাদাবাবু। লক্ষ্মী জানান দেয়—ওরা নাকি নোক ভাল নয়। পারুল বলে এট্টা মেয়ে অগ্যে,গরে কাজ করত ওগার বাড়ি, আংগার বস্তিতে থাকে। সে বললে বৌটা নাকি বড্ড হান হান কাট কাট করে।

—তা আমরা যে খুব ভাল বুঝলে কী করে? নাকি খাওয়ার কথা বলেছি বলে—।

তিতো আর বিষাক্ত কিছু যেন ছিটকে আসতে চাইছিল আমার বাসি মুখ দিয়ে। সামলে নিই নিজেকে। লক্ষ্মী শোনায়—ওই খাওয়ার ব্যাপারে বলতি এলাম আবার। বেল্পতি বলে কিনা খাবে নে তোংগার বাড়ি। তোমরা বরং টাকা কিছু বেইড়ে দাও। ফেলাটের ওরা এক শ দেবে বলেছিল, তোমরা না হয় পাঁচ দশ টাকা কম দিও।

কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারি না যেন। লক্ষ্মী ব্যাখ্যা করে শোনায়—কত করে বোঝালোম মেয়েটারে, বলি—বাবুরা নোক ভাল, খায় ভাল। ছুটো করে খা ছুপুর-বেলা। ওর মাও তাই বললে। কিন্তু মেয়ে রাজি নয়। বলে—একলা ভাল খেলি হবে! ঘরে মা আছে, ছোট ছোট ভাই বোন—ছুটো টাকা বেশি হলি বরং সকলার ভাল হবে। ত আমি আর কী বলব বল!

লক্ষ করি নি, বিজলীও কখন এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে। লক্ষ্মীর কথাগুলো শুনে সে আমার আগেই সারা দেয়—ভাল ত। ওইটুকুন মেয়ে তাহলে কত বোঝে ছাখ। ঠিক আছে, তাই হবে। নব্বুই টাকা করেই পাবে। বাসন মাজতে শুরু করুক দেখি। মাজ ত বেল্পতি, দেখি কেমন পারিস!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে সে। কাল রাতে আমাদের ফেলে দেওয়া আলুর খোসা, ডাঁটার ছিবড়ে, মাছের কাঁটা ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এঁটো থালার খোলে। উবু হয়ে বসে বেল্পতি সেগুলো খুঁটে খুঁটে জড়ো করে একটা বাটিতে। তারপর—

সকালের রোদ্দুরের মত আমার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসে বিজলী। আমি মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে যাই।

মন্দির ধ্বংস, মুসলিম শাসনে হিন্দু নির্যাতন : রটনা এবং ঘটনা

গৌতম রায়

৬ ডিসেম্বরের অযোধ্যাকাণ্ডের পর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই হিন্দু মৌলবাদের আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদপন্থার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। ভারতকে অবিমিশ্র হিন্দুর দেশ এবং মুসলমানদের সেদেশে অনধিকার প্রবেশকারী আগ্রাসী বিধর্মী বলে প্রচার করে হিন্দু মৌলবাদীরা দেশময় যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধেও অনেকেই সোচ্চার। বি জে পি ও তার দোসর সংঘ পরিবার ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার চালিয়ে জনতার মন বিষিয়ে দিয়েছে। ভারতের অতীত বা ইতিহাস সম্পর্কে যেমন, তেমনই তার বর্তমান নিয়েও অজস্র অনৃতভাষণ করছে এরা।

বাবরি মসজিদ ভাঙার আগে ও পরে এই অপকর্মের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার জন্য তারা কাশ্মীরে মুসলিম মৌলবাদের হাতে অসংখ্য হিন্দুমন্দির ধ্বংসের কথা প্রচার করেছে। বিধ্বস্ত মন্দিরের সংখ্যা নিয়ে বি জে পি ও সংঘ পরিবারের শীর্ষনেতারা অবশ্য কখনই একমত হতে পারেনি। কেউ বলেছেন ২৩টি, কেউ ৫৬টি, কেউ বা ৬৩টি, আবার আডবাণীর মত কেউ কেউ ৩০০ মন্দির ধ্বংস হবার খবরও দিয়েছেন এবং এই খবরে ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরে কোনও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় তাদের 'ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ' আখ্যা দিয়ে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেছেন। তাঁদের এই অভিযোগের জুৎসই জবাব দিতে না পেরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা হয়ত মরমে মরে ছিলেন। কাশ্মীর একটি সুদূর, প্রত্যন্ত হিংসাকবলিত উপত্যকা। সেখানে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি গোপনে স্বাধীনতার দাবিতে রাষ্ট্রবিরোধী সশস্ত্র হিংসাত্মক লড়াইয়ে ব্যাপৃত। উপত্যকার হিন্দু পণ্ডিতরা ভয়ে সপরিবারে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছেন। কী জানি, ওখানকার উগ্রবাদীরা হিন্দুমন্দির ভাঙলেও ভাঙতে পারে। কিন্তু 'ইণ্ডিয়া টুডে' 'ফ্রন্ট লাইন' প্রভৃতি পত্রিকার সাংবাদিকরা ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে মনস্থ করেন। সচিত্র তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে, ২৩ বা ৩০০ কেন, একটি হিন্দু মন্দিরও গত ক বছরে মুসলিম মৌলবাদের হাতে আক্রান্ত হয়নি। সংঘ পরিবারের নেতারা যে রকমারি তালিকা পেশ করেছিলেন, সেগুলি সবই ভুয়া। যে গোটা দুই মন্দির অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেবাইতরাই জানিয়েছেন, সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিবিনিময়ের মাঝখানে পড়ে যাওয়াতেই সেটা ঘটে, কেউ ওই মন্দির ঈর্ষা করে ভাঙতে বা হামলা করতে আসেনি, এবং যথাসময়ে সেগুলির মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে।

ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলমানরা কাশ্মীরে তাদের গরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে হিন্দুর ধর্মস্থান ভাঙছে, অতএব হিন্দুরাই বা বাবরি মসজিদে চড়াও হবে না কেন, বিশেষত ওই মসজিদ যখন রামলালার পবিত্র জন্মস্থান কলুষিত করেই গড়ে ওঠে? এরকম একটা ধারণা প্রচার করে হিন্দু মৌলবাদীরা অশিক্ষিত ও অসতর্ক হিন্দু জনমানস উদ্বেলিত করার চেষ্টা করে। তাতে সফলও হয়। অথচ বাস্তবে দেখা গেল, কাশ্মীরে মন্দির ধ্বংসের গল্পটি রামজন্মস্থানের মতই কাল্পনিক এবং ভিত্তিহীন। ঘটমান বর্তমান নিয়ে অনুসন্ধান করে অনায়াসে সত্যাসত্য নির্ণয় করার অবকাশ আছে এমন ঘটনা নিয়েও যেখানে এ ধরনের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা যায়, সেখানে সুদূর অতীত নিয়ে, ইতিহাসের কাল নিয়ে মিথ্যা প্রচার ত আরওই সুবিধাজনক। হিন্দুত্ববাদীরা এজন্যই ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ সম্পর্কে গণধর্মান্তর, পাইকারি মন্দির ধ্বংস এবং ব্যাপক হিন্দু নিগ্রহের অতিকথা প্রচার করে চলেছে। তাদের এই প্রচার আজকের নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের উপনিবেশ রক্ষার উপযোগী বিভেদপন্থার অঙ্গ হিসাবে তাদের খয়ের খাঁ ঐতিহাসিকরা এই অতিকথাগুলির সৃষ্টি করেন উনবিংশ ও বিংশ

শতাব্দীতে। সে সময়েই মধ্যযুগের, অর্থাৎ তুর্কি আগমনের পরবর্তী ইতিহাসকে 'মুসলিম যুগ' আখ্যা দেওয়া হয় এবং হিন্দু বা আর্য, ব্রাহ্মণ্য ভারতের গৌরবের অবমূল্যায়ন ও অধঃপতনের জন্য, এই মুসলিম যুগের ঘাড়েই যাবতীয় দোষ চাপানো হয়। মুসলিম শাসক মাত্রেই হিন্দুবিদ্বেষী এবং সেই কারণে মন্দির ধ্বংসকারী এবং হিন্দুদের ধর্মান্তরণকারী জালিম—এই ধারণা লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হতে থাকে। ঐতিহাসিকদের এই প্রমাদ আজ হিন্দু মৌলবাদীদের খুব কাজে লাগছে। তাদের অপপ্রচার কিছুটা বৈধতা ও যৌক্তিকতা পেয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশের কাছে নাইটহুড পাওয়া কিংবা জাতীয় অধ্যাপকের শিরোপা পাওয়া ঐতিহাসিকদের বক্তব্যে।

কিন্তু ইতিহাস কোনও নৈর্ব্যক্তিক সত্য নয়, ঐতিহাসিকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যার ভিয়েনে জারিত তত্ত্বকথাও। এবং যুগের সঙ্গে সঙ্গে, গবেষণার বিকাশ ও নানা অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অনেক প্রাচীন অতিকথা অসার ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়, আলোকিত হয় অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিন্দ, সংযোজিত হয় অভিনব মাত্রা। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই ঘটেছে। যদুনাথ সরকারদের ঐতিহাসিক প্রমাদ ঘুচিয়ে দিয়েছে আতহার আলি, ইক্তেদার আলম খান, ইরফান হাবিব, রমিলা থাপর, বিপন চন্দ ও রামশরণ শর্মার গবেষণা লব্ধ ইতিহাসচর্চা। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যসূচির বাইরে এই সব গবেষণা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সর্বজনপাঠ্য ইতিহাস কেতাবের ব্যাপক পাঠকশ্রেণী এখনও আগেকার ভ্রান্তিই কণ্ঠস্থ করে চলেছে। আর সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এই ইতিহাসের পাঠই মৌলবাদী রাজনীতিকদের জন্য তৈরি রাখছে উর্বর জমি, যাতে বিদ্বেষের বীজ বুনে চলেছে হিন্দুত্ববাদীরা।

তথাকথিত মুসলিম যুগে ভারতে গোটা শাসকশ্রেণীও কখনও মুসলিম ছিল না। বাদশা বা সুলতান মুসলমান হলেও দেশের শাসকগোষ্ঠী, আমির-ওমরাহ-ফৌজদার-মনসবদার ও অভিজাততন্ত্রের গরিষ্ঠ অংশই ছিল হিন্দু। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মুসলিম শাসকরা দেশের প্রথা, পদ্ধতি, ব্যবস্থা কোনও কিছুতেই জোর করে কোনও পরিবর্তন আনতে চাননি। হিন্দু রাজা ও ভূস্বামীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই যে তাঁদের পক্ষে গদিতে থাকা সম্ভব, এ তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন। তাই যে ঔরঙ্গজেবকে সর্বাপেক্ষা হিন্দুবিদ্বেষী বলে প্রচার করা হয়, তাঁর আমলেই দেখি বাদশাই প্রশাসকদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

শাসকরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলেও অনিবার্যভাবে তাঁদের হিন্দুবিরোধী হতে হবে, পৌত্তলিকতা ও আচারসর্বস্বতার বিরোধী হতে হবে, এরকম ধারণা যে কত ভুল, রমিলা থাপর ও বিপন চন্দরা তা দেখিয়েছেন "সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা" শীর্ষক পুস্তিকায়। এজন্য তাঁরা মুসলিম দরবারি কলমচিদের রচনার সাক্ষ্য মেনেছেন। কাজি মুগিস উদ্দিন মুসলিম বাদশাদের শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে সখেদে বলেছিলেন, "রাষ্ট্রকে ওঁরা কখনও ইসলাম সম্মত করতে দেননি। কোরান-হাদিশের নীতি নির্দেশের পরোয়া করতেন না সুলতানরা, উলেমা মৌলবিদের কথাতেও বিশেষ কান দিতেন না।" ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই একের পর এক সুলতান শরিয়তকে শিরোধার্য করার অবাস্তবতা স্বীকার করে নেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারনি লেখেন—"পয়গম্বরের অনুশাসন মেনে রাজ্য চালানো সম্ভব ছিল না, এ ব্যাপারে বরং খুসরু পরভেজ বা ইরানের নৃপতিদের নীতি বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়।" তবাকৎ-ই-আকবরি গ্রন্থে নিজামউদ্দিন লিখে গেছেন—"সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন রাষ্ট্রের ব্যাপারকে ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন।" জিয়া বারনির মতে একই কথা প্রযোজ্য ফিরোজ শাহ তুঘলক সম্পর্কেও। তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহি' গ্রন্থে বারনি লেখেন, "অপরাধীদের শাস্তিবিধান কিংবা রাজকীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তুঘলক ঈশ্বরভীতির দ্বারা পরিচালিত হতেন না। রাজকার্যের স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে, যা ভাল মনে করতেন, শরিয়তবিরোধী হলেও সেটাই প্রয়োগ করতেন।" কাজি মুগিস উদ্দিনের সঙ্গে আলাউদ্দিন খিলজির কথোপকথন আজ সুবিদিত। আলাউদ্দিন নির্দ্বিধায় তাঁকে বলেছিলেন—"আমি জানিনা রোজকেয়ামতের দিনে মহামহিম আল্লা আমার জন্য কী রেখে দিয়েছেন। তবে সরকারের স্বার্থে আমি যা সঠিক মনে করেছি, তাই করে গেছি।" ঐতিহাসিক এম হাবিব তাই সঠিকভাবেই বলেছেন, বিদেশাগত হলেও মুসলিম বাদশারা যে ছ-সাতশ বছর হিন্দুস্থানের মসনদে গদিয়ান থাকতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁদের শাসন কোনও ভাবেই ইসলামি শাসন ছিল না। থাকলে এক প্রজন্মও তাঁরা টিকতেন না।

ইসলামি অর্থাৎ শরিয়তি শাসন কায়েম করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না বলেই মুসলিম শাসকদের যেমন জোর করে কোটি কোটি হিন্দুকে গণ ধর্মান্তরিত করার প্রয়োজন হয়নি, তেমনই তাঁরা হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে

জেহাদ ঘোষণা করার অর্থাৎ পাইকারি হারে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার কোনও তাগিদও অনুভব করেননি। বরং একের পর এক মুসলিম বাদশা হিন্দু মনসবদারদের আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে জায়গির দান করেছেন। সবচেয়ে 'ধর্মান্ধ' সুলতান ঔরঙ্গজেবের কথাই ধরুন। এক ধর্মান্ধ সুন্নি ওমরাহ আমিন খানকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন—"জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্মের কী সম্পর্ক ? প্রশাসনের কাজকর্মে ধর্মের নাক গলানোর কী অধিকার আছে ? তোমার জন্যে তোমার ধর্ম, আমার জন্যে আমার।" (স্টাডিজ ইন সোশাল হিস্ট্রি—মডার্ন ইণ্ডিয়া গ্রন্থে বরুণ দে রচিত নিবন্ধ)। শেষের কথাগুলি বস্তুত কোরানেরই প্রতিধ্বনি। একইভাবে দেখি মেবারের রাজা রাজ সিংহকে প্রেরিত একটি নিশান-এ ঔরঙ্গজেব লিখছেন—"যে রাজা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখায়, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই অপরাধী।" (আতহার আলির মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার ঔরঙ্গজেব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) এটাও কোরানের কথা। এবং এই সহিষ্ণুতা ও উদারতাই ছিল ঔরঙ্গজেবের নীতি। নিঃসন্দেহে তিনি ধর্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তা হলে তাঁকে হিন্দুবিরোধী ধরে নেওয়া হবে কেন ? মুসলমান মানেই হিন্দুবিরোধী, এটা এ যুগের হিন্দু মৌলবাদীদের কুসংস্কার। এই কুসংস্কারকে মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে আরোপ করা হবে কেন ? বস্তুত, ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রমাণ একাধিক ঐতিহাসিক তুলে ধরেছেন। পট্টভি সীতারামাইয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ফেদার্স অ্যাণ্ড দ্য স্টোন্‌স' এ ব্যাপারে একটি পথিকৃৎ রচনা। এ ছাড়া ঐতিহাসিক বি এন পাণ্ডে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরের সংগ্রহশালায় রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে তিনি উদ্ধার করেন ঔরঙ্গজেবের একের পর এক ফরমান, যেগুলি তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তাঁর 'ইসলাম অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন' গ্রন্থে। এই ফরমানগুলিতে দেখা যাচ্ছে, উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দির, চিত্রকূটের বালাজি মন্দির, গৌহাটির উমানন্দ মন্দির, শত্রুঞ্জয়ীর জৈন মন্দির এবং অসংখ্য গুরুদ্বার সহ প্রতিটি বিখ্যাত ধর্মস্থানেই ঔরঙ্গজেব অর্থ বা জায়গির দান করছেন, কখনও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, কখনও মন্দিরগুলির দুরবস্থা ঘোচানোর জন্য। এই তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে ঔরঙ্গজেব সংক্রান্ত অধ্যায়গুলির পুনর্লিখন অনেকদিনই জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতায় প্রতিশ্রুত সরকার সে কাজে হাত দেননি। হিন্দুবাদীরাও তাই সুযোগ পেয়ে গেছে মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মুণ্ডপাত করার।

মন্দির ধ্বংসকারী হিসাবে ঔরঙ্গজেবের যে কুখ্যাতি আজ জগৎজোড়া, তার পিছনেও সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু ঐতিহাসিকদের হাত যশ যথেষ্ট। এমন নয় যে, ঔরঙ্গজেব কোনও ধর্মস্থান ধ্বংস করেননি। করেছিলেন। কিন্তু ধর্মস্থান হিসাবে নয়, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের আখড়া কিংবা যৌনব্যভিচারের কেন্দ্র হিসাবেই সেগুলি আক্রান্ত হয়। মধ্যযুগে ধর্মস্থানগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত হত রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত রচনার নিরাপদ ঘাঁটি হিসাবে কোনও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই যা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। ধর্মকে বর্মরূপে ব্যবহার করে তার আড়ালে জাগতিক ও লৌকিক ষড়যন্ত্র চালালে যদি ধর্মস্থান অপবিত্র না হয়, তবে সেই ধর্মস্থান চূর্ণ করলে তা পবিত্র হয়ে যাবে কেন ? গোলকুণ্ডার মুসলিম নবাব তানাশাহ ঔরঙ্গজেবকে দেয় খাজনা না দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলে তার ওপর একটি জামা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। খবর পেয়ে ঔরঙ্গজেব সেই মসজিদ গুঁড়িয়ে দেন এবং খাজনার অর্থ উদ্ধার করে তা রাজকার্যে ব্যয় করেন। মধ্যযুগের মানদণ্ডে একে ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে কি ? বি এন পাণ্ডে এবং পট্টভি সীতারামাইয়ার গ্রন্থে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কচ্ছের হিন্দু রানি ওই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দ্বারা বিশ্বনাথ মূর্তির নিচেই গোপন প্রকোষ্ঠে ধর্ষিতা হওয়ার সংবাদে ক্রুদ্ধ ঔরঙ্গজেব হিন্দু রাজাদের সোচ্চার দাবিতেই ওই মন্দির ধূলুণ্ঠিত করে পুরোহিতকে শাস্তির নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন পূজনীয় বিশ্বনাথ এই ব্যভিচারের ঘটনায় অপবিত্র ও কলুষিত হয়েছে, তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হোক। একেও কি খুব অন্যায় বিচার বলা যাবে ? কিংবা এই ঘটনা দিয়ে কি ঔরঙ্গজেবকে মন্দির ধ্বংসকারী হিন্দু বিদ্বেষী প্রমাণ করা যাবে ? ঘটনাটির সত্যতা উপরোক্ত দুই ঐতিহাসিক ছাড়াও পাটনা যাদুঘরের প্রাক্তন কিউরেটার ডঃ পি এল গুপ্তা স্বীকার করে নিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন মন্দির ভেঙে ঠিক ঐস্থানেই মসজিদ বানানো হয়েছিল। এটা আর-একটা মিথ্যা রটনা। মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা হয়েছিল অন্য জমিতে এবং ভিন্ন সনে।

জিজিয়া কর আরোপকে যাঁরা ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের প্রমাণ বলে প্রচার করেন, তাঁরা ভুলে যান (১) একা

ঔরঙ্গজেবের সময় নয়, হিন্দুরা দীর্ঘ চারশ বছর ধরে জিজিয়া দিয়ে গেছেন, (২) মসনদে বসার দীর্ঘ বাইশ বছর পরে দেশের অর্থনীতির দুরবস্থা ঘোচাতেই এই তীর্থকর বসান (ক্ষমতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে নয়), (৩) ১৬৭৯ সনে এই কর বসানোর পর ঔরঙ্গজেবের আমির ওমরাহদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং ইসলামে ধর্মান্তরের ঘটনাও একেবারেই বৃদ্ধি পায় না এবং সর্বোপরি (৪) মুসলিমদেরও তীর্থকর হিসেবে জাকৎ দিতে হত। 'সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা' পুস্তিকায় রমিলা, বিপন ও রামশরণ এই দিকগুলি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তা ছাড়াও ডঃ সতীশ চন্দ্রের প্রবন্ধ 'জিজিয়া অ্যাণ্ড দি স্টেট ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দি সেভেনটিন্থ সেনচুরি'-তে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে। হিন্দুবাদীরা হয়ত জানলে ভিরমি খাবেন যে, মালাবার উপকূলের হিন্দু জামোরিন রাজারা তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে নিয়মিত জিজিয়া আদায় করতেন এবং ঔরঙ্গজেব বৃদ্ধ, শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধী হিন্দু পুণ্যার্থীদের জিজিয়ার আওতা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। জিজিয়া – ঔরঙ্গজেব – হিন্দুবিদ্বেষ — এধরনের সমীকরণ অতএব অর্থহীন।

হিন্দুবিদ্বেষী ত তিনি ছিলেনই না, অনেক দুঃস্থ হিন্দুকে ঔরঙ্গজেব ভূমি ও সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন। তাঁর এধরনের ৪৮টি দানপত্র সংগ্রহ করেছেন ডঃ কে কে দত্ত তাঁর 'সাম ফরমানস, সনদ্‌স অ্যাণ্ড পরওয়ানাস' (১৫৭৮-১৮০২) গ্রন্থে। এই অনুদানগুলি সবই ছিল নিঃশর্ত এবং স্থায়ী। গ্রহীতারা ছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসী ও তাঁদের শিষ্যরা, অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু সৈনিক ও কানুনগোরা। প্রাপকদের মধ্যে যেমন ছিলেন হতদরিদ্র দুখরন মিসির, তেমনই ছিলেন করমুক্ত ৫৫ বিঘা জমির গ্রহীতা লীলা ব্রাহ্মণ। বিনিময়ে এমনকি রাজানুগত্যের শর্তও ঔরঙ্গজেব দাবি করেননি। অধ্যাপক গ্রেওয়াল ও গোস্বামী রচিত গ্রন্থ 'দি মুঘলস অ্যাণ্ড দি যোগীস অব জাখবর'-এ দেখা যাচ্ছে, উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের ছোট্ট গ্রাম জাখবরে বসবাসকারী নাথ যোগীদের প্রচুর করমুক্ত জমি দান করেন ঔরঙ্গজেব, বিনিময়ে অবশ্য এই যোগীরা মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য পূজা প্রার্থনা করতেন।

ঔরঙ্গজেবের মত আর কোনও রাজাকে ইতিহাসে এতখানি ভুল বোঝা হয়নি। অন্যায়ভাবে, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে হিন্দুবিদ্বেষী সাজানো হয়েছে। এসব দেখে শুনেই জনৈক কবি সখেদে বলেছেন :

> হাজারোঁ সাল মে ব্যস ইয়াদ উনকো দস্তান ইতনি
> কে আলমগির হিন্দু-কুশ থা, জালিম থা, সিতমগর থা।

তাঁকে হিন্দুবিদ্বেষী ধরে নেবার একটা কারণ অবশ্য তাঁর আমলে বিভিন্ন হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহ। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে জাঠ, সতনামি, মারাঠা ও শিখদের বিদ্রোহের পিছনে ধর্মীয় নিপীড়নের কোনও ঘটনা ছিল না, ছিল আর্থ-রাজনৈতিক কারণ। মারাঠারা হিন্দু রাজ্য স্থাপনের জন্য মোটেই লড়াই করেনি। শিবাজিকে কেন্দ্র করে এ যুগের শিব সৈনিকরা যতই মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াক, বহু মারাঠা শিবাজির বিরুদ্ধেই এবং ঔরঙ্গজেবের পক্ষে লড়াই করেছিল। বস্তুত শিবাজির সঙ্গে লড়াই যত ধুন্ধুমার হতে থাকে, ঔরঙ্গজেবের আমির-ওমরাহদের মধ্যে মারাঠা সর্দারদের সংখ্যা ও অনুপাত ততই বাড়তে থাকে। আতহার আলি তাঁর 'মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার ঔরঙ্গজেব' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মারাঠা অভিযানের দ্বিতীয় পর্বে ঔরঙ্গজেবের শাসকগোষ্ঠীতে মারাঠা মনসবদারদের সংখ্যা ২৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মারাঠা শিখ বা রাজপুত শৌর্যকে ব্রিটিশের খয়ের খাঁ ঐতিহাসিকরা হিন্দু ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এখনকার হিন্দুত্ববাদীরা সেই সূত্রেই শিবাজিকে 'হিরো' বানিয়ে ঔরঙ্গজেবকে খলনায়ক সাজাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এ প্রসঙ্গে সংঘ পরিবারের মান্য হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য বড় বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—"মহারাষ্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল। মোগল দরবারেও তদানীন্তনকালে যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুনার রাজদরবার কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতে এই যুগই ভারত ইতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ এবং ওই দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী ; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।"

একথা ঠিক যে আজকের আধুনিক অর্থে ঔরঙ্গজেবকে 'সেকুলার' বলা কঠিন। সেই অর্থে কিন্তু সমান কঠিন এমন কি আকবরকেও 'সেকুলার' বলা। কোনও মধ্যযুগীয় নৃপতির

পক্ষেই আধুনিক ইউরোপীয় সংজ্ঞায় সেকুলার থাকা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার কথা বলে না, সর্বধর্মসমভাব, অর্থাৎ সব ধর্মের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলে। অন্তত কার্যক্ষেত্রে সেটাই অনুশীলন করার কথা বলে। সেই নিক্তিতে ওজন করলে আকবর যতটা অসাম্প্রদায়িক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিলেন, ঔরঙ্গজেবও ততটাই। নিজে নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, একথা না বলে বলা উচিত নিষ্ঠাবান মুসলমান বলেই তাঁর পক্ষে হিন্দুবিদ্বেষী হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ইসলাম ধর্মবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয় না, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতাকে অপরাধ বলে মনে করে। তাই যিনি ইসলামের যথার্থ অনুগামী, কায়-মনোবাক্যে নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামকে জীবনে পালন করেন, তিনি কেমন করে কাফেরের রক্তে নিজের তরবারি সিক্ত করবেন? ঔরঙ্গজেবও করেননি। যাঁরা ইসলামি সম্পর্কে ভ্রান্তি ও বিকৃতি প্রচার করতে চান, তাঁরাই ঔরঙ্গজেবকেও কালিমালিপ্ত করেন।

বলিষ্ঠ লেখনীর অধিকারী গৌতম রায় আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক।

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা
ও
অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশ-স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
২। প্রকাশের ব্যবধানকাল : মাসিক
৩। মুদ্রক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
৪। প্রকাশক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
৫। সম্পাদক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম-ঠিকানা :
নীরা রহমান
৮এ, সামসুল হুদা রোড, কলিকাতা-১৭

আমি নীরা রহমান, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান

‘ঘরে বাইরে’—ভারতীয় নারীর সঙ্কট : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এবং সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

‘ভোরের আলো আকাশের সীমা ছাড়িয়ে সবে নেমে এসে পড়েছে বাড়ির ছাদে, অন্ধকারের আবছা ওড়নাটা তখনও একেবারে সরে যায়নি, এমন সময় শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে রুক্ষ পথের বুকে এসে নামে দুটো আরবী ঘোড়া। সদর ছাড়িয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলে গড়ের মাঠের দিকে। দারোয়ান কাজ ভুলে যায়। প্রতিবেশীরা হতভম্ব। রাজপথের লোকেরা অবাক। এ কী কাণ্ড? বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে তাকালে একে অপরের দিকে। সবাই চেয়ে আছে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় কই আরোহীদের। না, ভুল বলা হল বুঝি। দুজন আরোহী কোথায়? একজন যে আরোহিণী! আরোহিণী? চোখের ভুল নয়ত? কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ায় চড়া মেয়ে? তাও মেমসাহেব নয়, বাঙালী। পথিকরা থমকে দাঁড়ায়। চোখ কপালে ওঠে পড়শিনীর। না, আর কোন ভুল নেই। ঐ তো আঁটসাঁট পোশাকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন কাদম্বরী, ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলেছেন স্বামীর সঙ্গে, ময়দানের দিকে।’[১]

উনিশ শতকের কলকাতার এই বৃত্তটি অধিকাংশতই কল্পিত বটে কিন্তু ভিত্তিহীন বা অবাস্তব নয় মোটেই। ঠাকুর-বাড়ির অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক এক গবেষিকা এইভাবেই শুরু করেছেন তাঁর লেখা।

কাদম্বরী দেবীর বিয়ে হয়েছিল যে পরিবারে সেই পরিবারের মেয়েদের গঙ্গাস্নান করতে হলে বদ্ধ পালকিতে চাপিয়ে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর বেহারারা সেই বদ্ধ পালকি চুবিয়ে দিত জলে। এইভাবে সারতে হত সেদিন তাঁদের গঙ্গাস্নান। আবার, কোনো আত্মীয়ের বাড়ি যেতে হলে—পরপুরুষের নজর যাতে না পড়ে—বাড়ির উঠোন থেকে পালকিতে চাপত মেয়েরা, নামত গিয়ে একেবারে আত্মীয়ের বাড়ির উঠোনে। এই অবস্থাটা যে শুধুমাত্র ঠাকুর-বাড়ির ক্ষেত্রেই তা কিন্তু নয়। গোটা বাংলার মেয়েদের ঘিরে তখন এমনই সব বাধা-নিষেধের গণ্ডি। রাজশাহী (অধুনা বাংলাদেশ) নিবাসী এক মহিলা ১৮৭১ সনে রচিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

কোন স্বাধীনতাই নেই তাই আমাদের দেশের নারীদের অবস্থা যেন খাঁচায়-ভরা পাখির মতো, নিজের ছোট্ট জগৎ-টুকুর মধ্যেই কেবল তাদের ঘোরাফেরা···নারীদের না আছে কিছু করার স্বাধীনতা, না-আছে কিছু পছন্দ করার স্বাধীনতা। হায়! নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব অসীম, কিন্তু নারীর কোনো অধিকারই নেই।’[২]

১৮৭৫ সনে মায়াসুন্দরী নামে এক মহিলা তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় বসে লিখেছেন :

মেয়েদের কিছু দেখার অধিকার নেই। কিছুদিন হলো বিরাট হাওড়া ব্রীজ তৈরী হয়েছে। যারাই দেখছে পাঁচমুখে প্রশংসা করছে। আমরা শুধু শুনেই যাচ্ছি, ব্রীজটা স্বচক্ষে দেখে সংশয় ঘোচাতে পারছি না।’[৩]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কাদম্বরী নন, শুধু ঠাকুরবাড়িতে নয়, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের বৃহদংশে এক পরিবর্তনের হাওয়া প্রথম নিয়ে আসেন ঠাকুর-পরিবারেরই আর এক দম্পতি—সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে বসবাস-কালে লক্ষ করেছিলেন ঘরে এবং বাইরে, উভয়ক্ষেত্রেই, মহিলাদের সঙ্করণ কেমন অবাধ। অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ স্ত্রীকে ইংল্যাণ্ড থেকে পাঠানো চিঠিতে লিখলেন :

‘তোমার কি মনে লাগে না আমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না, ও

আপনার মনে স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে না। তোমার বিবাহ তো তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে। তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন।··· যেখানে স্ত্রীলোকের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে শ্রীসৌভাগ্য অনেক দূর।···তুমি যে পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না।'[১]

প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই আমরা আর এক দম্পতির সংলাপে :

স্বামী। আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা-পাওনা বাকি আছে।···এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে— তুমি যে কাকে চাও তাও জাননা, কাকে পেয়েছ তাও জাননা।···সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে।

স্ত্রী। পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

স্বামী। বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও না কেন।[২]

এই দম্পতি নিখিলেশ ও বিমলা—'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মুখ্য দুই চরিত্র। ওপরের ওই কথোপকথন ও সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি উভয়ক্ষেত্রেই নারীমুক্তির প্রশ্নটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রচলিত গড়নের পুনর্মূল্যায়নের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। বাস্তবের এবং কল্পনার দুটি পুরুষই সমাজ-আরোপিত ধ্যানধারণাগুলি সরিয়ে রেখে দাম্পত্য সম্পর্কটি নিয়ে নতুন করে বিচার-বিবেচনায় আগ্রহী। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার অভিঘাতের পরিণাম।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বাঙালি মানসে ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটছিল। বাঙালি পুরুষ সেদিন নিজেকে যেমন নারীকেও তেমনি নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। সেই প্রথম সে লক্ষ করল কী বিপুল পরিমাণ অবিচার ও অবমাননার তলায় চাপা পড়ে শোচনীয় দুর্দশায় জীবন কাটায় এদেশের মেয়েরা। ফলে, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অনেকটাই সেদিন চালিত হয়েছিল এমন ভাবে যাতে সমাজে নারীর অবস্থানকে অন্তত খানিক উন্নত করা যায়। মেয়েরাই বলি হত যেসব সামাজিক কুপ্রথার, যেমন সতীদাহ, আমরণ বৈধব্য, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠল। পালটা প্রতিরোধের বাধাবিপত্তি কাটিয়ে সংস্কারকেরা একটু একটু করে সফল হতে লাগলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তনেও পুরুষেরাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেদিন। উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলনের জোয়ার কিন্তু শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই আসেনি, ঘটনাচক্রে তখন য়ুরোপ ও আমেরিকাতেও বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছিল। যদিও অবশ্য এদেশে সেই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশ্চিমে কিছু পুরুষ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও নারীমুক্তির সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল মূলত মহিলাদেরই উদ্যোগে। অন্যদিকে বাংলায়, সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মত কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, নারীর বন্ধনমোচন আন্দোলনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল পুরুষেরাই।[৩] যদিও তাদের প্রচেষ্টার ফলে যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছিল তা পশ্চিমের তুলনায় ছিল নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। নিচের সারণী থেকে স্পষ্ট হবে যে খুবই সামান্য সংখ্যক বাঙালি মহিলা সেকালে গৃহকর্মের বাইরে স্বাধীন পেশা বেছে নিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড, ১৮৯১ :	নিজের জীবনযাপনের জন্য উপার্জন করেছেন এমন শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ২০০,০০০। এঁদের মধ্যে—
	১৪৬, ৩৭৫ জন শিক্ষক,
	৫৩, ০৫৭ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স এবং
	১৭,৮৫৯ জন সেক্রেটারি ও ক্লার্ক ;
ইংল্যাণ্ড, ১৮৯৬ :	শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্তদের ৭০ শতাংশই মহিলা ;
অবিভক্ত বাংলা, ১৯০১ :	মহিলা চাকুরেদের মধ্যে—
	১,১৫৬ জন শিক্ষক
	৭৪৯ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স এবং
	৬৬ জন ক্লার্ক ;

পেয়াল রাখা দরকার যে অবিভক্ত বাংলার এই পরিসংখ্যানের মধ্যে ইংরেজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় মহিলা কর্মীদের সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। আসলে, দেশীয় মহিলা কর্মীদের তুলনায় সেদিন এদের সংখ্যাটাই ছিল বেশি।[৪]

রবীন্দ্রনাথ শৈশবেই সংস্কারমুক্ত উদারনৈতিক ভাবধারা

আত্মস্থ করেছিলেন। স্বদেশে সংস্কার আন্দোলনের প্রবল গতিবেগের প্রভাব ও পাশ্চাত্য সমাজ-পরিস্থিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ—এই দুয়ের টানে গড়ে উঠছিল তাঁর মনোভঙ্গি। মনে রাখা ভাল যে রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'অ্যাবজেকশন অব উইমেন'।[৫] ঘরে বাইরের এমন পরিবেশে লালিত নব্য-ধারণা পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সনে তাঁর প্রথম দফার ইংল্যাণ্ড প্রবাস থেকে পাঠানো এক চিঠিতে লিখেছিলেন : ইংল্যাণ্ডে এসে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে আমাদের 'বিশ্ব' থেকে নারীকে নির্বাসিত করে নিজেদেরকে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রগতি থেকে কী পরিমাণ বঞ্চিত করেছি।[৬] তিরিশ বছর পরে তিনি আবার লিখবেন, 'পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত।'[৭] আরও সাত বছর পর ১৯১৬-তে প্রকাশিত হয় 'ঘরে বাইরে'। এর মাঝের দশকগুলিতে, বিশেষত, এই শতকের গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল কিন্তু ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব হঠাৎই এই আন্দোলনে সঞ্চারিত করে দেয় এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রাবল্য। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই প্রবল হাওয়া সমস্ত অবরোধ ভেঙে ঢুকে পড়ে বাঙালির অন্তঃপুরে, 'খাঁচাবন্দী' বাঙালি নারী আন্দোলনের সমর্থনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সেই সামাজিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সেদিন বড় হয়ে উঠেছিল যে প্রশ্ন তা হল—নারী-পুরুষ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি কী হবে আর নতুন গড়ে উঠতে-থাকা এই সমাজে নব্য-নারীর ভূমিকাটিই বা কী হবে। তিনি এও জানতেন যে এই প্রশ্নগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে ফেলা যায় না, বিবাহ ও পরিবার—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ভবিতব্যের সঙ্গে জড়িত করে নিয়ে করতে হবে যাবতীয় বিচার-বিবেচনা। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন—য়ুরোপে সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত রাষ্ট্র, কিন্তু ভারতবর্ষে অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে, রাষ্ট্র নয়, সমাজের ভূমিকাই মুখ্য। আর, এই সমাজকে আগলে রাখে, স্থিতি যোগায় এক সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান—পরিবার।[৮] ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব যে বহুশতাব্দী ধরে স্বীকৃত একথাটি তিনি বুঝেছিলেন। অতি সম্প্রতি জঁ লুই ফ্লঁদ্রি এবং মাইকেল এ্যাণ্ডারসন প্রমুখ সমাজ-বিজ্ঞানীরা আমাদের জানিয়েছেন যে পশ্চিমে পরিবার সম্পর্কিত ধারণা তেমন প্রাচীন নয় মোটেই।[৯] প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন মানেই এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করছিলেন। বরং, এই জীর্ণ প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত বলেই মনে করতেন তিনি। বিবাহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নির্ভর যে সমাজ-ব্যবস্থা তাতেই যখন চিড় ধরেছে তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই ব্যবস্থার আকার-আকৃতির নবীকরণও প্রয়োজন। আলোচ্য উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেন বিবাহ-প্রতিষ্ঠান এবং স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের সমস্ত স্তরবিন্যাসকে সমাজ-পরিবর্তনের আলোয় পুনর্মূল্যায়ন করতেই চাইছেন।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে শুধুমাত্র ত্রিকোণ প্রেমের সহজ-সরল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়নি। উপন্যাসটির আখ্যান গড়ে উঠেছে তিনটি মুখ্য চরিত্রের আত্ম-কথা বর্ণনের মধ্য দিয়ে। এই বর্ণন কখনো ক্রমান্বয়ে, কখনো একটি বর্ণনা অধিক্রমণ করেছে অপরটিকে। ফলে আমরা শুধুমাত্র গল্পের তিন মুখ্য চরিত্রের অকপট স্বীকারোক্তিই পাই না, সেই সঙ্গে আবার তিনজনের প্রত্যেককেই অপর দুজনের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে পাই। লক্ষণীয় যে, লেখক যেহেতু বিমলাকে অতীত সম্বন্ধে অন্তশ্চিন্তাশীল হবার সুযোগ দিয়েছেন তাই তার আত্মকথন বিরাজ করে, বর্ণনার এক ভিন্ন স্তরে। নিখিলেশ আর সন্দীপ কিন্তু ঘটনাগুলির বর্ণনা করে সেগুলি ঘটবার অব্যবহিত অবকাশে। সর্বত্র বিরাজমনে সর্বজ্ঞ কোনো আখ্যানকার নেই এই উপন্যাসে। তাই, উপন্যাসটি পড়ার সময় চতুর্থ যে দৃষ্টিকোণটি ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে আমাদের কাছে তা স্বয়ং লেখকের।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিভিন্ন স্তরের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের পশ্চাদ্‌পটের ভূমিকাটি খতিয়ে দেখা যাক প্রথমে। নিখিলেশের পরিবার বনেদি—অভিজাত। এই পরিবারের পিষ্টাচার এবং প্রথাগুলি হিন্দু ঐতিহ্য ও ইসলামী সারক্ষণশীলতার অনুবর্তী।[১০] এই বংশের প্রথম উচ্চশিক্ষিত সন্তান নিখিলেশ। মূলত তারই উৎসাহে আধুনিকতার অতি মৃদু একটি হাওয়া সবে বইতে শুরু করেছে এই বাড়িতে। সে মদ ছোঁয় না, পূর্বপুরুষদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য দোষগুলির কোনটিই তার নেই। সচরাচর বেসব 'গুণ' থাকলে এ-বাড়িতে পুরুষকে পুরুষ বলে মানা হয় তার কোনটাই নিখিলেশের নেই। তার দুই দাদাই ছিল নিঃসন্তান এবং স্ত্রীর থেকে রক্ষিতাদের ওপরেই তাদের টান

ছিল বেশি। তার ঠাকুরমার—সংসারের সর্বময় কর্ত্রী তিনিই —'পুরুষোচিত' চরিত্রদোষ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশ্রয় ছিল বরাবরই। ভারতীয় নারীর আর্কিটাইপ এই বৃদ্ধা যে শুধু-মাত্র বিশ্বাস করতেন যে অবাধ নারীসম্ভোগ ও যথেচ্ছাচার পুরুষের জন্মগত অধিকার এবং এমনতর স্খলন 'পুরুষোচিত' তাই নয়, তিনি এ জাতীয় ব্যভিচারে উৎসাহও দিতেন। বিধবা বড় বৌ যদিও বহুদিন যাবৎই পূজা-অর্চনা জপ-তপ নিয়েই আছেন, তবু জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন তিনি। মেজ বৌ-এর চরিত্রটিকে আরও বিস্তারিত করে এঁকেছেন লেখক। তাঁর বয়স কম, তিনি পরিহাসপ্রিয়। বিমলা তাঁকে তেমন পছন্দ করত না, অমার্জিত বলে মনে হত তার মেজ-জা-কে। কিন্তু মেজ-বৌ সদাহাস্যময় ভাব দিয়ে আড়াল করতে জানতেন তাঁর ক্ষত। নিখিলেশের বয়স যখন ছয় তখন বিয়ে হয়ে এই সংসারে এসেছিলেন তিনি—ন বছর বয়স তখন তাঁর। নিখিলেশকে তিনি স্নেহ করেন, সবরকম আঘাত-কষ্ট থেকে আড়াল করে রাখতে চান তাকে। সেকালের হিন্দু পরিবারে অন্দর এবং বাহির মহলের স্পষ্ট সীমারেখাটিকে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন আশ্চর্য নিপুণতায়। অন্দরের অবরোধের মধ্যে নারীর জগৎ, ক্বচিৎ-কদাচিৎ তার বাইরে বেরোতে পারত সে। পর্দা-প্রথা ছিল সুকঠোর, তার একচুল এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না। যাইহোক, নিখিলেশের পরিবারের পাশাপাশি, যেন প্রায় এক বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসেবেই, রবীন্দ্রনাথ অল্প দু-একটি আঁচড়ে অন্য একটি পরিবারের ছবি এঁকেছেন এই উপন্যাসে—সেই পরিবার হল বিমলার পিতৃসংসার। বিমলার বাবা গরিব, আভিজাত্যও নেই। পরম শ্রদ্ধাভরে পতিসেবা করতেন বিমলার মা। স্বামীর মঙ্গল কামনায় সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে লালপাড় শাড়ি পরে সংসারে শান্তি বজায় রেখে চলাই ছিল তাঁর কর্তব্য। মায়ের এই ভূমিকাটিকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়ে বিমলা এসে পা রেখেছিল নিখিলেশদের সংসারে। যত্নে ভক্তিভরে সিঁথিতে সিঁদুর দিত সেও। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সেও স্বামীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করত রোজ।

সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধ আর পশ্চিমের উদারনৈতিক ভাবধারা—এই দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল নিখিলেশের জীবনদর্শন। সে মনে করত নারী-পুরুষ সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্য উভয়েরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়াটা জরুরি। নিখিলেশ চেয়েছিল বিমলা কেবলমাত্র মেয়েমানুষ হয়ে না-থেকে ব্যক্তি হয়ে উঠুক। বিমলা বলে, 'আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।'[১৪] সমান অধিকারের এই ধারণা স্পষ্টতই পশ্চিম থেকে আহৃত।[১৫] এই চিন্তা ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্যত্র লিখেছেন যে ভারতীয় বিবাহ স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার মান্য করে না।[১৬] বিমলা যেমন পরিবার থেকে এসেছে তেমন পরিবারে 'সতীত্ব'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'সতীত্ব'—লিঙ্গ-নির্দিষ্ট (gender-specific) এবং এই পরিভাষাটির অর্থ হল নারীর শুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা। সমস্ত দেশেই সামাজিক প্রথা-প্রচলনের চাপে পড়ে মেয়েরা শৈশব থেকে একটি লিঙ্গ-ভূমিকা (gender-role) আয়ত্ত করে নেয়। উনিশ শতকের বাঙলায় শিশুবয়স থেকেই মেয়েদের শেখানো হত পতি-দেবতা—স্বামী পূজ্য। মিথ, পুরাণকাহিনী, লোককথা, আচারব্রত, পূজা-পার্বণ দৈনন্দিন জীবন সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই এই শিক্ষাটি যাতে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় তার একটা সযত্ন প্রয়াস চলতই। ফলে, বিয়ের পরে মেয়েরা স্বামীকে কখনোই মানুষ বলে—ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পারত না। শত-শত বছরের পুরোনো মানসিকতা দিয়ে গড়া পুজোর বেদীতে বসিয়ে রাখত তারা 'স্বামী'-কে আজীবন। 'স্বামী' শব্দটির অন্য অর্থ যে 'প্রভু' এ-কথাটি এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পুনর্নিমিতির কথা নিখিলেশ যেমন করে ভাবছিল তা যে কেবল তদানীন্তন সমাজ পরি-স্থিতির সাপেক্ষে আমূল সংস্কারাত্মক ছিল তাই নয়, বিমলার পক্ষেও ছিল এক প্রবল ধাক্কা। বিমলা সর্বাঙ্গীকরণে নিখিলেশের সেই দাবি মেনে নিতে পারছিল না। সিমন দ্য বোভোয়া লিখেছেন, 'One is not born but rather becomes a woman···it is civilization as a whole that produces this creature between male and eunuch, which is described as feminine.'[১৭] দুই যুগের সংযোগস্থলে দাঁড়ানো সেকালের ভারতীয় নারীর সঙ্কট ছিল এই যে পুরুষ-প্রধান সমাজ যে নারীত্বকে বহুযুগ ধরে লালন করে আসছিল তার দায় থেকে মুক্ত হতে পারছিল না সে কিছুতেই। বিমলা শিশুকাল থেকে যে সামাজিক অস্তিত্বে ক্রম-অভ্যস্ত, নিখিলেশ চাইছিল সেই অস্তিত্বেরই বিনির্মাণ (deconstruction) ঘটাতে। যে ঐতিহ্যের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে—মনে মনে মেনে নিয়েছে যে ব্যবস্থাকে সেই ব্যবস্থাটাকে ধ্বসিয়ে দিতে

উদ্যোগী নিখিলেশ। পশ্চিমের অনুপ্রেরণায় এমন এক নারী-পুরুষ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল বিমলাকে, যার সঙ্গে আদৌ কোনও পরিচয় ছিল না তার। ফলে, এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের আবর্তে পড়ে তার মানসিক শান্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এমনকি এই পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়ে নিখিলেশও অব্যাহতি পেল না সঙ্কট থেকে। স্বামীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হল বিমলাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। যদিও নিখিলেশ জোর করে কিছুই চাপিয়ে দেয়নি তার ওপর, তবুও স্বামীর অভিলাষ-পূরণ—পুরুষের বিলাসী আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধনের মধ্য দিয়েই শুরু হল বিমলার জীবনের প্রলয়-সঙ্কট। বিমলা তার ঘরের বিজনতা ছেড়ে বিরাট বহির্বিশ্বের উদ্দেশে পা বাড়াল কিছু না-জেনে না-বুঝেই।

নিখিলেশের এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে কিন্তু ছিল শুধুমাত্র তার স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব-বিকশিত করার অবিমিশ্র আকাঙ্ক্ষা। সে বৃঝতে চেয়েছিল, বিমলা সত্যিই তাকে ভালবাসে, নাকি সে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজ-আরোপিত স্ত্রীর ভূমিকাটিই পালন করে চলেছে নিষ্ঠাভরে। নিখিলেশ চেয়েছিল তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কটি হয়ে উঠুক সামাজিক নির্দেশের আওতা ছাড়িয়ে দুজন ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক। আদতে নিখিলেশ নয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই প্রশ্নটিকে খতিয়ে দেখতে চাইছিলেন। এরপর, সন্দীপ যখন উল্কার বেগে এসে ঝড় তুলল বিমলার জীবনে, আর বিমলাও যখন এই প্রবল কর্মশক্তিপূর্ণ যুবকটির প্রতি আবেগতাড়িত আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করল তখন নিখিলেশ বুঝল যে বিমলা পুরুষের মধ্যে শুধুমাত্র অদম্য-অপ্রতিরোধ্য সত্তাটিই খোঁজে এবং এমনকি তথাকথিত 'পুরুষোচিত' স্খলনগুলির প্রতি প্রশ্রয়ও পোষণ করে মনে মনে। সে যে কেমন করে পুজো করতে শুরু করে সন্দীপকে নিখিলেশ তা লক্ষ করে। নিখিলেশ বুঝতে পারে, সুখের সংসার ছেড়ে ঘরের বাইরে অনিশ্চিত বিশ্বের পথে পা বাড়ানোর জন্য আদৌ প্রস্তুত নয় বিমলা। আরও বোঝে যে, কল্পনায় যে-বিমলাকে সে সযত্নে গড়েছিল—লালন করেছিল এতদিন, বাস্তবের বিমলা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, আর সেটা না-বুঝেই কতকগুলো মূল্যবান আদর্শ বিমলার ওপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছিল সে। বিমলার প্রতি নিখিলেশের অনুভবের সন্ধরণ চলছিল পাশ্চাত্যের সেই অতি পরিচিত রোমান্টিক প্রেমের পথে, যে মতাদর্শে নারী বিবেচিত হয় পুরুষেরই সত্তার প্রতিবিম্ব, দর্পণ-প্রতিমা (mirror image), হিসেবে। স্ত্রী যখন পুরোপুরি পর হয়ে যেতে চলেছে তখন নিখিলেশ মুখোমুখি হয়ে পড়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের :

'বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী? কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিন-রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ···ও যদি বলতে চায়, না, আমি আমিই। তখনই আমি বলব—সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী? ওটা কি একটা যুক্তি? ওটা কি একটা সত্য, ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগা-গোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করা যায়?'[১৮] উনিশ শতকের শেষভাগে বা বিশ শতকের গোড়ায় পাশ্চাত্য মধ্যস্থতা (mediation) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ক্রম-আলোড়নের সেইকালে ভারতীয় নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না এই প্রশ্নের একটি সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া। বাস্তবিকই, সে কি প্রথমে এক ব্যক্তি, পরে কারোর স্ত্রী? নাকি উলটোটা? এই বিশ শতকের শেষভাগে পৌঁছেও ত ভারতীয় আধুনিক নারীর পেছু ছাড়েনি এই সঙ্কট। বাইরের আকার-আকৃতিতে অনেক জটিলতা জড়ো হলেও মূলে ত সমস্যাটা রয়ে গেছে সেই একই।

সন্দীপের কাছে কিন্তু নিখিলেশ-বিমলার সম্পর্কের এই ফাঁকিটুকু ধরা পড়ে যায়, 'আমি মনে মনে হাসলুম। যারা ন বছর দিনরাত একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না'।[১৯] শুধু যে নিখিলেশই বিমলাকে বুঝতে ভুল করেছিল তা নয়, বিমলাও চিনত না তার স্বামীকে পুরো-পুরি। বস্তুত, সন্দীপ এসে হাজির হবার আগে পর্যন্ত সে নিজেকেই ভাল করে চিনত না। বিমলা প্রায়শই বিমর্ষ বোধ করত তার রূপ নেই বলে, গায়ের রঙ ফর্সা নয় বলে। নিজের চেহারা নিয়ে বিমলার এই খুঁত খুঁত ভাবটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এদেশের মেয়েদের গায়ের রঙ সম্পর্কিত দুর্বলতাই ফুটিয়ে তুলেছেন। আজও গায়ের রঙ ফর্সা না কালো তা নিয়ে ভারতীয় মেয়েদের মাথা ঘামানোর বিরাম নেই। আদতে, বিমলা ত পুরুষের চোখে মেয়েরা কেমন হলে সুন্দর কেমন না হলে নয় সেই ধ্যানধারণা মেনে নিতেই অভ্যস্ত, পুরুষের পছন্দ অপছন্দের কাছে সঁপে দিয়েছে সে নিজের সুন্দর-অসুন্দর বোধ। শিশু বয়স থেকে তাকে এমনি করেই ভাবতে শেখানো হয়েছে। বিয়ের পরে সে

যখন দেখল যে তার স্বামী তেমন সুপুরুষ নয়, তখন বিমলা হতাশ হয়েছিল। সন্দীপ আসবার আগে পর্যন্ত এই হতাশাকে সে পতিভক্তি দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিল, বাপের বাড়ির শিক্ষানুযায়ী 'স্বামী'-তত্ত্বটিরই পুজো করে চলেছিল একমনে। কিন্তু, নিখিলেশ এই প্রশ্নহীন পূজা-ভক্তি মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের যে নির্মিতি নিখিলেশ গড়তে চাইছিল বিমলার ওপর তার দাবি ছিল আরও অনেক বড় ত্যাগের জন্য—তার মনের মধ্যে প্রোথিত নারীর ভূমিকা সম্পর্কীয় সনাতন ধারণাটির আমূল উৎপাটন। নিখিলেশ যেসব পরিবর্তনের সূচনা করেছিল পরিবারের মধ্যে—তার জীবনে বিমলা সে সবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। নিখিলেশ চাইছিল তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সত্তাটাকে জাগিয়ে তুলতে, বিকশিত করতে সম্পূর্ণ মানুষটাকে। বিমলাকে পাশ্চাত্য চলনবলন সাজ-সজ্জা শেখাবার জন্য সে ইংরেজ গভর্নেস রেখে দিয়েছিল। এই শিক্ষা-দীক্ষা বিমলার মধ্যে একটা বদল ত ঘটাচ্ছিলই, নিজের মত করে ভাববার একটা তাগিদ গড়ে উঠছিল তার মধ্যে। যতই সেটা হচ্ছিল ততই স্বামীর সব কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল তার পক্ষে। 'সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।'[২০] নিখিলেশ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বদলাতে শুরু করল। সচরাচর যাকে 'পৌরুষ' বলে স্বামীর মধ্যে তারই প্রকাশ দেখতে চাইছিল বিমলা, আর লিঙ্গ নির্মিতির (gender-construct) প্রচলিত গড়নের ফাঁদে আটকে পড়ছিল সে আরও সুনিশ্চিত ভাবে।

সম্ভবত, এক ধরনের ভিক্টোরীয় পরিমিতি বোধ এই ত্রিকোণ সম্পর্কের শরীরী দিকটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা থেকে বিরত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। পাশ্চাত্য মধ্যস্থতার এ আরেক উদাহরণ। ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে যৌনতাকে কখনোই স্পষ্ট করে তোলেন নি রবীন্দ্রনাথ, কাহিনী-কথনের মধ্যে চরিত্রগুলি যতটুকু ইঙ্গিত রেখেছে এই প্রসঙ্গে পাঠককে তা বুঝে নিতে হয়। নিজের দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে বিমলা বলে, 'আমার দেহকে তুমি এমন ভাবে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য। এতে আমার মনে গর্ব আসে; আমার মনে হয়, এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ।'[২১]

পশ্চিমে পুরুষেরা দীর্ঘকাল ধরে নারী সম্পর্কে তিনটি চিরাচরিত ধারণা পোষণ করে এসেছে—(ক) গার্হস্থ্য তত্ত্ব—নারীর জগৎ ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, (খ) প্রকৃতির অভিপ্রায় তত্ত্ব—মাতৃত্বেই নারীর পরম বিকাশ, এবং (গ) পূজাবেদী তত্ত্ব—নারী দেবীতুল্য। ফরাসী দার্শনিক অগুস্ত কোঁৎ এই তৃতীয় মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তিনি মনে করতেন সন্দর্ভবাদ (positivism) 'encourages, on intellectual as well as moral grounds, full and systematic expression of the feeling of veneration for woman in public as well as private life, collectively as well as individually.'[২২] স্ত্রীর প্রতি নিখিলেশের এই সন্দর্ভবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই দাম্পত্যজীবনে বিমলার যৌন অতৃপ্তির কারণ। ইন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাকে যে সে কোন গুণের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করে না একথা নিখিলেশ বুঝতে দিয়েছে বারবার। একারণেই যে কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ তার অরুচি সেকথা সে নিজেই বলেছে। নিখিলেশের স্বভাবের এদিকটা সম্বন্ধে কটাক্ষ করেই সন্দীপ বলে, 'ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলই ঝাপসা করে দেখতে চায়, সেই জন্যই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে।'[২৩]

সন্দীপের জ্বালাময় ভাষণ শোনার পর বিমলা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলে যে সে সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতে চায়। সন্দীপের আগুন-ঝরানো বক্তৃতায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবার ক্ষমতার মধ্যে সে পৌরুষ খুঁজে পায়। নিখিলেশের স্বদেশপ্রেমের মৃদুতা তার বরাবরের অপছন্দ। স্বদেশপ্রীতির নিজস্ব ধরনের সমর্থন সে পেয়ে যায় সন্দীপের মধ্যে। গোড়ায় সন্দীপের ছবি দেখে তার মনে হয়েছিল, 'তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারিনে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমনকি রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানিনে কেন আমার মনে হয়েছিল, উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া।'[২৪] কিন্তু আবেগমথিত ভাষণে জনচিত্তকে আন্দোলিত করতে দেখে সন্দীপ সম্পর্কে তার মনোভাব বদলে গেল, '...তিনি যে অমরলোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন।'[২৫] নিখিলেশ যদি এখন কোনভাবে সামান্যতম সমালোচনা করে সন্দীপের তবে বিমলা তার স্বামীকেও অগ্রাহ্য করার জন্য প্রস্তুত। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে সন্দীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে বলে

যত্ন করে সাজে বিমলা। মনে মনে ভাবে এই দেবদূতটি নিশ্চয়ই তার মধ্যে বিশ্বজননীকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তার ভয় মেয়েরা ঠিক মত সাজ-প্রসাধন না-করলে পুরুষেরা যে আবার নারীর মধ্যে দেবীকে দেখতে পায় না। এইভাবে বিমলা নিজেই নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে এবং নারী-দেবী-মাতৃভূমি সমীকরণ তত্ত্বের বশীভূত হয়ে পড়ে। লক্ষণীয় যে, যদিও রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির অভিপ্রায়' তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তবুও নবছর বিবাহিত জীবন যাপনের পরেও তিনি বিমলাকে রেখেছেন সন্তানহীন করেই। সংসারকর্মেও আর পাঁচজন মহিলার তুলনায় তার অবদান প্রায় কিছুই নয়। সেখানে বিমলার ভূমিকা তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন—উনিশ শতকের যে-কোনও বিত্তশালী নিশ্চিন্ত পরিবার-কর্ত্রীর যেমন—ওপর ওপর দেখভাল করার মধ্যে।

সন্দীপের কাছে নিজের দেবীভাব প্রকাশের জন্য সাজ-সজ্জা করার পর মেজ-জা যখন তাই নিয়ে পরিহাস করে তখন বিমলা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে বোঝায় যে সে যদি যথোপযুক্ত সাজ না-করে স্বামীর বন্ধুর সামনে বেরোয় তবে নিখিলেশ ক্ষুব্ধ হবে। বিমলা আসলে নিজেকেই বুঝতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক। উনিশ শতকী সমাজ সেদিন বাঙালি নারীকে এই সঙ্কটের মুখোমুখি হবার সঠিক পথ ঠিক করে নেবার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইছিলেন যে মানসিক ভাবে অপ্রস্তুত অনভিজ্ঞ বিমলা অজানার মধ্যে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়েছে। যুক্তিহীন আবেগ তাকে বিপথে চালিত করেছে। তার মনের বিকাশের জন্য নিখিলেশ সত্যিকারের কী চেষ্টা করেছিল তার কোনও হদিশ আমরা উপন্যাসে পাই না। নজর দেওয়া হচ্ছিল পশ্চিমী ফ্যাশান অনুযায়ী সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাসের দিকে, আর বিমলাকেও তা মেনে নিতে হয়েছিল। এছাড়া যেটুকু বুঝতে পারি তা হল—নিখিলেশ বিমলাকে এক-আধটু রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়িয়েছে,[২৬] গ্যালাটিয়া-পিগম্যালিয়ন কাহিনী তার জানা আর এই দম্পতির শোবার ঘরে এমিয়েলস জর্নাল রাখা থাকে। কিন্তু সন্দীপ যে চিত্রকলা সংক্রান্ত বইটির কথা বলে—যার উল্লেখে বিমলার কান লাল হয়ে ওঠে—সেই বইটি রাখা থাকে পুরুষমানুষের খাসতালুক, নিখিলেশ যেখানে দিনের বেশির ভাগ সময়টাই কাটায়, সেই বাইরের ঘরে। সন্দীপের ভাষায় 'স্ত্রী পুরুষের মিলননীতি নিয়ে স্পষ্ট স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে'[২৭] যে বইটায় নিখিলেশ সেই ইংরেজি বইটি পড়েছে। কিন্তু বিমলাকে সে বইটি পড়তে দেয়নি কখনোই। সন্দীপ স্পষ্ট ভাষায় জানায় যে বিমলার বইটি পড়া উচিত। নিখিলেশ তা নিয়ে আপত্তি তোলে না, শুধু বলে, 'প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে করি যখন তার সঙ্গে নিবৃত্তিকেও সত্য বলি।'[২৮] এই উপন্যাসের প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত এক প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে যদিও নারীকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক যাতে সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে এও শেখানো উচিত যে কী ভাবে সে একজন খাঁটি নারী হতে পারবে। অনেকে মনে করেন, রুশোর 'এমিল' নামে বইটিতে যে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এ যেন প্রায় তাই।[২৯] বাস্তবিকই, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুরুষের পৃথক পৃথক লিঙ্গ ভূমিকায় (Gender role) বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে 'প্রকৃতির অভিপ্রায়' তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন এবং মানতেন যে মাতৃত্বই নারীর মূল ভূমিকা সেকথা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি।

যাই হোক, সন্দীপের প্রতি বিমলা যে আকর্ষণ অনুভব করত তা কিছু কণ্টকহীন ছিল না, অস্বস্তি আর সংশয়ের খোঁচা ছিলই তার মনে। তাদের সম্পর্কটা জিইয়ে রাখার সুযোগ করে দিচ্ছিল ওই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাহানা। সন্দীপের স্বরূপ আর লালসা যতই উন্মোচিত হয়ে পড়তে লাগল ততই শ্রেয় আর প্রেয়-র টানাপোড়েনে ছিন্নভিন্ন হতে লাগল বিমলা।[৩০] শেষ পর্যন্ত, সন্দীপের ক্রম-অবনতি, নিজের গভীর লজ্জাবোধ আর অমূল্য-র প্রতি বাৎসল্য বাঁচিয়ে দিল বিমলাকে। নিখিলেশের ক্ষমা অনুতপ্ত বিমলাকে স্ত্রীর হৃত আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল অবশেষে।

বিমলার সঙ্গে পরিচয়ের পরই সন্দীপ ধরে ফেলেছিল তার দুর্বলতা, বুঝেছিল বন্ধু-পত্নীটি তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সেও অমনই ভান করতে লাগল যেন বিমলাকে পূজাবেদীতে বসিয়ে তার কাছ থেকেই নতুন করে প্রেরণা খুঁজে নিচ্ছে সে দেশমাতৃকার কাজে। আদতে এইভাবেই সন্দীপ মাতল বিমলার মন ভোলানোর খেলায়। দেশ জুড়ে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করার যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দীপের এই মন-ভোলানোর কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। স্বাদেশিকতার এই চরমপন্থী আন্দোলন যা ক্রমশই সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তাও কিন্তু পশ্চিমী অনুপ্রেরণায়—বিশেষ করে মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি-র মত ইতালি-একীকরণ নায়কদের সাফল্যের দৃষ্টান্তে

উদ্বুদ্ধ হয়ে। বিশ শতকের গোড়ায় বুয়ের-যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যাণ্ডের পরাজয় অথবা জাপানের কাছে আর এক বড় য়ুরোপীয় দেশ রাশিয়ার পরাজয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। অস্থির ও অঙ্গী করে তুলছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের একাংশকে! আর, এইসঙ্গে হিন্দুত্ববোধের পুনরুজ্জীবনের ফলে দেশকে 'ভারতমাতা' রূপে পূজা করার প্রবণতা জোরদার হয়ে উঠতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাতা থেকে 'বন্দে মাতরম' উঠে এল দেশবাসীর গলায় শ্লোগান হয়ে, উদ্বুদ্ধ করল সহস্র সহস্র যুবককে। রবীন্দ্রনাথের মত নিখিলেশও জাতীয়বাদী আন্দোলনের আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার এমন প্রশ্রয় দেওয়াটাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। বিমলার ঝোঁক আর সমর্থন কিন্তু গোড়া থেকেই সন্ত্রাসবাদের দিকে। সন্দীপের জীবনদর্শনে পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও ইন্দ্রিয়গত ধ্যানধারণার প্রভাব স্পষ্ট। সে পুরুষ—অদম্য, স্থূল, অমার্জিত পুরুষ। 'আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীটাকে লুঠ করছি, আমরা যতই তার কাছে দাবী করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে।'[৩১] স্বদেশ এবং নারী সম্বন্ধে এই হচ্ছে সন্দীপের মনোভাব। এহেন সন্দীপ যে তার বন্ধু-পত্নীকে বন্ধুর উপস্থিতিতেই ভ্রষ্ট করতে উদ্যোগী হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিমলাকে সে 'মক্ষিরাণী' বলে সম্বোধন করে। তার নারীকে জয় করার ক্ষমতাও অসীম। তার বিজিতের তালিকায় হিন্দু বিধবা যেমন ইংরেজ-বণিতাও আছে তেমনই। রবীন্দ্রনাথ তার সম্পর্কে বারবার 'লোলুপ', 'স্বার্থপর', 'অপরিশীলিত'—জাতীয় বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। কারোর কারোর হয়ত মনে হতে পারে যে সন্দীপকে আঁকা হয়েছে একটি একমাত্রিক চরিত্র হিসেবে। কিন্তু মনোযোগী পাঠক মাত্রেই খেয়াল করেন যে এই প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়লিপ্সু ব্যক্তিটির মনে কিন্তু ক্রমেই এক অন্তুত দুর্বলতা তৈরি হচ্ছিল। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিমলাকে ব্যবহার করেনি। লক্ষণীয় যে, সন্দীপ যখন বাস্তবিকই তাকে ভালবাসতে শুরু করল ঠিক তখনই বিমলা পারল সন্দীপ সম্বন্ধে তার ঘৃণা-প্রেমের মিশ্র-অনুভব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র 'ঘরে বাইরে' প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে'।[৩২] জাতীয়বাদী আন্দোলনের গোড়ার রবীন্দ্রনাথ যদিও যুক্ত ছিলেন তার সঙ্গে, কিন্তু পরে যখন বুঝলেন যে এই আন্দোলন তাঁর আদর্শের পরিপন্থী তখন তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কোন কোন সমালোচক মনে করেন রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন ভারতের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বিমলার মধ্য দিয়ে।[৩৩] পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা দেশের প্রতীক বিমলার সামনে তিনি খোলা রেখেছেন দুটি পথ—একটি তাকে বেছে নিতে হবে। সেই দুটি পথ নিখিলেশ আর সন্দীপের। নিখিলেশের মতে—বলপ্রয়োগের সহজ-সরল পথে জাতির মঙ্গলের কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং ধৈর্য ধরে জাতির সত্তা বিকাশের এবং তার ঐক্য ও সংহতি রক্ষার সাধনা করলে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। সন্দীপ মনে করে সাম্যতা এলেই হল—তা সে যে কোন উপায়েই হোক। বিমলাকেই ঠিক করে নিতে হবে, সে কী করবে—নিখিলেশকে মানবে, না কি মেনে নেবে সন্দীপকে। এই ব্যাখ্যা যদি গ্রাহ্য হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের সীমিত পরিসরকে ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে আরও অনেক ব্যাপ্ত ও আরও গভীর এক প্রশ্ন নিহিত হয়ে আছে এই উপন্যাসে। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ যদিও সন্দীপের মত স্বদেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করা মোটেই অনুমোদন করেন না, তবু কিন্তু সঙ্কটাপন্ন দেশের প্রতীক হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন একটি নারী-চরিত্রকেই। এটা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির অভিপ্রায়' তত্ত্বের—জীবনের দীর্ঘভাগ জুড়ে যে তত্ত্বকে তিনি সমর্থন করেছিলেন—এক প্রসারণ মাত্র। নারীত্ব ও মাতৃত্বের এবং মাতা ও দেশমাতার সমীকরণ—এই লিঙ্গ-নির্মিতি, হয়ত খানিকটা তাঁর অজানতেই বোনা হয়ে গেছে এই উপন্যাসের মধ্যে। আবার আরেক ভাবে দেখলে, নিখিলেশ ও সন্দীপ দুই পরস্পর-বিরোধী মতের বাহক আর বিমলা যেন এই দুই বিপরীত ভাবনার মধ্যবর্তিনী এক নিষ্ক্রিয় আধার। এই নিষ্ক্রিয়তাও সূচিত করে এক যৌন-গূঢ়ার্থ।

কিন্তু ওই দুই-শতকের সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কি সত্যিই সম্ভব ছিল ভারতীয় নারী-পুরুষের সম্পর্ক-বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখানো? বিমলা কি শেষ পর্যন্ত ফিরে যায় না অনুগতা-পত্নীর অবস্থানেই? উপন্যাসে দেখতে পাই নিশুত রাতের গভীর শুব্ধতার মধ্যে বিমলা যখন চেষ্টা করতে থাকে তার কান্না চাপার জন্যে তখন নিখিলেশ বিছানা ছেড়ে উঠে এসে তাকে দেখতে পেয়ে বিহ্বল

হয়ে ভাবে, 'আমি একে বিচার করবার কে? হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমার মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড় হাতে তাকে প্রণাম করি।'[৩৪] তারপর সে পরম স্নেহভরে স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলে বিমলা স্বামীর পা দুটি জড়িয়ে ধরে ভাবে, 'কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে আজ, ন' বছর আগে যে নহবৎ বেজেছিল সে আর ইহজন্মে বাজবে না। এঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন দেবতার পায়ে মাথা খুড়ে মরলে সেই বউ চন্দন-চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে। কতদিন লাগবে আর—কত যুগ—কত যুগান্তর—সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর একটি বার ফিরে যেতে! দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে।'[৩৫] রবীন্দ্রনাথ বিমলার মুখ ঘরের দিকে ফিরিয়ে দেন আবার, কিন্তু একবার বাইরে বেরিয়ে এসে ঘরে ফেরার পথ কি হারিয়ে ফেলল সে? তার স্বামীর ক্ষমা কি পারবে তাকে ফেরাতে? 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হবার দশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ লিখবেন, '…বিবাহে আজও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ সত্য হয় নি। আজও এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছু না কিছু বিরোধ ও কোনো না কোনো পক্ষের অবমাননা আছে।'[৩৬] কাহিনীর শেষে পৌঁছে দেখি, স্বামী-স্ত্রীতে মিলে কলকাতায় গিয়ে থাকবে ঠিক করার ফলে নিখিলেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু, তার নতুন পরিবারটিও যে নিছকই এক দম্পতি-কেন্দ্রিক হবে না তা আমরা বুঝতে পারি, যেহেতু মেজোরানীও সাদরে অন্তর্ভুক্ত হন সেই পরিবারে। রবীন্দ্রনাথ এখানে খানিক কাপসাই যেন রেখে দেন পরিবারটির চিত্রকে। উপন্যাস যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই শুরু হবে যে পরিবারটির সংসারযাত্রা তার চেহারাটি আমরা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারি না।

উপন্যাস রচনার প্রায় সাতদশক পর সত্যজিৎ রায় তৈরি করলেন তাঁর 'ঘরে-বাইরে'। কোনও সাহিত্যকর্ম যখন চলচ্চিত্রায়িত হয় তখন শুধুমাত্র এই মাধ্যমের পরিবর্তনের জন্যই কতকগুলি বদল ঘটে। তাছাড়া, পুনর্কথনের ফলে ব্যাখ্যার স্তরেও অনুপ্রবেশ ঘটে কিছু পরিবর্তনের। সত্যজিৎ বদল করতে শুরু করেন একেবারে বিষয়ের নামটি থেকেই। তিনি 'ঘরে' এবং 'বাইরে' শব্দ দুটির মধ্যে বসিয়ে দেন একটি 'হাইফেন'। আপাতদৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ। কিন্তু এর ফলে যে পরিবর্তনটি ঘটে যায় তা মোটেই তুচ্ছ নয়। সংযোজক-চিহ্নটির এই অনুপ্রবেশ নামটির ব্যঞ্জনার ব্যাপ্তিকে ব্যাহত করে। এমনকি, 'ঘরে' ও 'বাইরে'—এই দুটি জগতের মধ্যে তা এক সেতু হয়ে উঠে দুয়ের মধ্যবর্তী অভিপ্রেত দূরত্বকে অনায়াসে অতিক্রমণীয় করে তোলে। নিখিলেশ মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে-আসা বলতে ঠিক কী বোঝে একবার এমন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সত্যজিৎ বলেছিলেন, '… নিখিলেশ বিমলাকে বাইরে আনতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু সন্দীপের কাছেই আনতে পারল। উপন্যাসেও নিখিলেশ এর থেকে বেশি কিছু পারেনি।'[৩৮] স্পষ্টতই, সাহিত্য-কর্মটির মর্ম এই চলচ্চিত্র-নির্মাতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নি। নামের বদল তাঁর এই অক্ষমতারই পরিচায়ক।

চলচ্চিত্র-কর্মটি দেখতে দেখতে বা চিত্রনাট্যটি[৩৯] উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার সময় আমরা লক্ষ করি সত্যজিৎ কেমন করে রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। যদিও এই দূরগমন না কোনও তাৎপর্য প্রতিষ্ঠায় না কোনও নতুন ব্যাখ্যায় ভাস্বর করে তোলে উপন্যাসটির সারমর্ম। কেমন করে তবে বুঝেছিলেন তিনি এই সাহিত্য-কর্মটি? তাঁর মতে 'I feel that the central situation has a fantastic *draw* (ঝোঁকটি বর্তমান লেখকের)… Nikhilesh loves his wife deeply. But he is constantly in a state of doubt as he feels this woman has seen no man except him. So how can one say that she knows him properly?…So his wife must get out—he would bring her out. Not only would she come out, but she also meets other men. If she keeps on liking him as before after having known other men then that would be real love. But then she comes out…she prefers the man from beyond…Nikhilesh has the conviction that as a man…he is on a higher plane than Sandip. If his wife ever recognizes that, she should come back to him on her own accord. Then it will be profounder love… Unfortunately, before this can happen, the riot breaks out and Nikhilesh falls a victim to it.'[৪০]

তাহলে, সত্যজিৎ এই কাহিনী-কাঠামোর মধ্যে উপন্যাসটিকে ধরবেন বলেই ঘটিয়েছিলেন যাবতীয় বদল। কিন্তু, এই উপন্যাসটিকেই কেন বেছে নিয়েছিলেন তিনি? ১৯৬৯-৭০ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় এবং ফেলে আসা "পিরিয়ডে"। পিরিয়ড সম্পর্কে আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ওটা আমার খুব ইনটারেসটিং মনে হয়। রিক্রিয়েশনের মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে, একটা চ্যালেঞ্জ আছে।'[৪০]

এই 'পিরিয়ড'-এর প্রতিই যে তাঁর মনোযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি তা আমরা বুঝতে পারি অন্তত্র যখন সত্যজিৎ বলেন, '…there is no description of Nikhilesh's house anywhere in the book…occasionally there is a description of what Bimala is wearing, but none of the male character's dresses are ever described.'[৪১] রবীন্দ্রনাথ যে কেন শুধুমাত্র বিমলার পোশাকের বর্ণনাই দিয়েছেন তার মূল কারণটি সত্যজিৎ বুঝে উঠতে পারেন না। বিমলা তার ঘরের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বেরিয়ে বিশ্বরঙ্গভূমিতে প্রথম পা রাখবে বলে নিজেকে যখন প্রস্তুত করে নিচ্ছে তখন যে পরিবর্তনগুলির মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হচ্ছিল তা প্রতীয়মান করে তুলবেন বলেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বিমলার পোশাকের দিকে। আমাদের মনে পড়ে সত্যজিৎ একবার তাঁর জীবনীকার মারি সীটনকে বলেছিলেন, 'I never had an urge to become a painter. My approach was more literarv and I thought of becoming an illustrator.'[৪২] বাস্তবিকই, বিশ্ববন্দিত এই চলচ্চিত্রকার ত এদেশে ইলাসট্রেটর হিসেবেও বিখ্যাত। খুঁটিনাটির দিকে নজর তাঁর বড় তীক্ষ্ণ এবং অনুপুঙ্খ দিয়েই তিনি পারেন তাঁর কাজকে বিশ্বাস্য করে তুলতে। 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রটি দেখার সময় আমাদের খেয়াল করতেই হয় নির্মাতা কেমন সযত্নে 'পিরিয়ড' সৃষ্টি করেছেন তাঁর এই কাজে।

এমনকি তাঁর চলচ্চিত্রে উপন্যাসটির অন্যতম বিষয় জাতীয়বাদ-সংক্রান্ত প্রশ্নটিও ব্যবহৃত হয় কাহিনীর কাল-পট হিসেবে, অর্থাৎ 'পিরিয়ড'-টিকে শুধুমাত্র ধরিয়ে দেবার জন্য। তাই আমরা ছবিটি দেখার সময় বাজারে বিদেশী পণ্য বয়কট করার আবেদন, আমদানী করা কম্বল পোড়ানো, মন্দিরে আগুন লাগানো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতেই দেখি শুধু। ঘটনাগুলি দানা বেঁধে ১৯০৫-এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন বোধগম্য সুসংহত চিত্র গড়ে তোলে না। তাছাড়া, এই দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়ে তিনি মূলত সন্দীপ চরিত্রের ওপরে আলোকপাত এবং তার জাতীয়বাদের ধারণাকেই স্পষ্ট করেন। আর তা করতে গিয়ে, হয়ত নিজের অজ্ঞানতেই, পরিচালক বেশি ঝোঁক দিয়ে ফেলেন সন্দীপের কার্যধারার ওপর। পক্ষান্তরে, নিখিলেশের জাতীয়বাদ সম্বন্ধীয় ভাবনাচিন্তা, যা আদতে স্বয়ং লেখকেরই, সম্পর্কে আমাদের ধারণা গড়ে নিতে হয় শুধুমাত্র তার প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে কথোপকথন এবং বর্ষীয়ান প্রজাদের প্রতি তার আবেদন জানানোর মধ্য দিয়ে। স্বদেশ ও বিমলার সমীকরণের যে নকশাটি উপন্যাসের মধ্যে সযত্নে বুনে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন সত্যজিৎ এই চলচ্চিত্রায়নে। ফলে, উপন্যাসের রাজনৈতিক মাত্রাটি চলচ্চিত্রের ত্রিকোণপ্রেমের মামুলি জটিলতায় ঢাকা পড়ে থাকে।

এই 'পিরিয়ড'-নিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিকভাবে ত্রুটিমুক্ত সাজসজ্জা সত্ত্বেও চরিত্রগুলিকে উনিশ শতকের শেষ বা বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাঙালি বলে মনে হয়না আদৌ। 'ঘরে-বাইরে' কি পুরোপুরিই একটি 'পিরিয়ড পীস' নাকি এর কোনও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা আছে—এমনই এক প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, 'এদুটো ব্যাপার ত বিকল্প নয়। সার্থক period piece যদি না-ই হবে, তার contemporary relevance-এর প্রশ্নই ওঠে না।'[৪৩] তিনি সম্ভবত মনে রাখেননি যে, সময়ের নির্যাস ধরার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র তার বাইরের রূপকে ধরতে গেলে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতাকেই সীমিত করে তোলা হয়। আর তাই, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং সত্যজিতের 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে রচিত হয়ে যায় এক সত্তাগত পার্থক্য। পিরিয়ড পুনঃসৃষ্টির ওপরে জোর দেওয়ার ফলে যে অসঙ্গতি তৈরি হয় সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রটিতেই তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য প্রভাব এই চলচ্চিত্রে সক্রিয় দুটি স্তরে: প্রাথমিক স্তরে পরিচালক যে প্রভাব আরোপ করেছেন আর অন্য স্তরে যা তাঁর অজ্ঞানতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের মাধ্যমে চুঁইয়ে ঢুকে পড়েছে। চিত্রনাট্যের সূচনাপর্বে দেখি যে নিখিলেশের বৌদি বাড়ির অন্দরমহলে বসে গ্রামাফোন রেকর্ডে গান শুনছে, আরো বুঝতে পারি এই বনেদী পরিবারে

পশ্চিম থেকে ভেসে-আসা পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সূচনার পরবর্তী ভাগে দেখা যায় নিখিলেশ নদীবক্ষে ভাসমান বজরায় বসে স্ত্রীকে ইংরেজি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে। সেই সঙ্গে, বিমলার স্বগতোক্তি থেকে জানতে পারি যে তার স্বামী বংশের প্রথম স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিমলাকে 'মেমসাহেব'-এ রূপান্তরিত করার 'খেয়াল' মেটাবার জন্য মিস গিলবি-কে নিয়োগ করে বাড়িতে আনা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, উপন্যাসে বিমলার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নিখিলেশের অদম্য প্রচেষ্টা চলচ্চিত্রে বিমলাকে পশ্চিমী কেতাদুরস্ত মহিলা করে তোলার নিছক খেয়ালে পর্যবসিত হয়েছে। নিখিলেশের এই খেয়ালীপনার ওপর পরিচালকের জোর দেওয়াটা বিমলার জ্যাকেট পরার দৃশ্যে ধরা পড়ে। বৌদি নিখিলেশকে বলে যে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য সে স্ত্রীকে পুতুল বানিয়ে খেলায় মেতেছে। নিখিলেশও বলে যে পুরুষ-মানুষের খেয়াল থাকতেই পারে। সূচনাপর্ব থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে উপন্যাসের তুলনায় চলচ্চিত্রে পাশ্চাত্য মধ্যস্থতার ধরনটি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপন্যাসে মিস গিলবির প্রসঙ্গ একটি পৃষ্ঠায় আড়াই অনুচ্ছেদে সীমাবদ্ধ। বিমলা কী শিক্ষা পাচ্ছে তাঁর কাছ থেকে তার কোনও স্পষ্ট হদিস নেই সেখানে। উপন্যাস থেকে জেনেছি যে বিমলা এই শ্বেতাঙ্গিনীকে তেমন পছন্দ করত না এবং পরে তিনি যখন লাঞ্ছিত হন তখনও বিমলার সহানুভূতি বরং প্রকাশ পায় লাঞ্ছনাকারীর প্রতিই। সত্যজিৎ কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্রে বিশদ করে দেখান বিমলা তার গভর্ণেস-এর কাছে কী কী শিখছে, কেমন করে 'মেমসাহেব' হয়ে উঠছে এবং এমনকি তাদের দুজনের সম্পর্কটিও কেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ। আর এই বিস্তারিত করার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য প্রভাবকে একটি স্তরে প্রক্ষেপ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, মিস গিলবির লাঞ্ছনায় নিখিলেশ এবং এমনকি বিমলাও কতখানি বেদনার্ত তা বোঝাবার জন্য একটি আলাদা দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। উপন্যাসটি লেখার সময় সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশে পাশ্চাত্য মধ্যস্থতার যতটুকু যেমন করে ধরা পড়ছিল তার ওপরেই ভর করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, সত্তর বছর পরে এই চলচ্চিত্রটি তৈরি করার সময় কিন্তু সত্যজিতের অঢেল সুযোগ ছিল তদানীন্তন কালের পাশ্চাত্য মধ্যস্থতার প্রশ্নটিকে আরও স্পষ্ট করে বুঝে নেবার। অথচ তা না করে, 'পিরিয়ড পীস' তৈরি করার আগ্রহের আতিশয্যে মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে ফেলেন তিনি পশ্চিমী প্রভাব প্রক্ষেপের ওপর। তাই তিনি নিখিলেশের কথাবার্তার মধ্যে এনে ফেলেন প্রচুর ইংরেজি শব্দ, তার ঘর সাজাতে ব্যবহার করেন বিদেশ থেকে আমদানীকরা চিনেমাটির মৈথুনরত নারীপুরুষের ও বর্শাধারী অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্তি। সন্দীপকে দিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাওয়ান। বিমলার স্বগতোক্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেন মিস গিলবির সহায়তায় সাধিত হয়েছে তার বেশভূষার পরিবর্তন। আর তাই তিনি এও দেখান যে বিমলা তার স্বামী ও বিধবা বড়ো জায়ের সামনেই বুকের আঁচল সরিয়ে একের পর এক জ্যাকেট পরে দেখছে। এই দৃশ্যটি গোটা চলচ্চিত্রকর্মটি বোঝার জন্য খুবই জরুরি। পূর্বে আলোচিত পাশ্চাত্য প্রভাবের দুটি স্তরই এখানে সক্রিয়। প্রাথমিক স্তরই এখানে সক্রিয়। প্রাথমিক স্তরে, বিমলার পোশাকের বিলাতিয়ানায় ঘটে এই প্রভাব-প্রক্ষেপ। আর দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ পরিচালকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব চুঁইয়ে ঢুকে-পড়া প্রভাবের দরুন বিমলার জ্যাকেট বদলানো ঘটতে থাকে স্বামী ও বড়ো জায়ের উপস্থিতিতেই। সত্যজিৎ খেয়ালই করেন না যে প্রায় এক শতক আগে বাঙালি পরিবারে—হোক সেই পরিবার যতই সাহেবিয়ানায় মত্ত—স্বামী ও জায়ের সামনে কোনও মহিলার পোশাক বদলানোটা কল্পনাতীত এক কাণ্ড, এমনকি বিংশ শতাব্দীর শেষে পৌছানো এই কালেও তা অসম্ভব।

চলচ্চিত্র-নির্মাতা দুটি ভিন্নস্তরের যৌনতার আভাস রেখেছেন নিখিলেশ-বিমলা ও বিমলা-সন্দীপ সম্পর্ক দুটির মধ্যে। এই চলচ্চিত্র তৈরি করার সময়ে ত বটেই—আজও—ভারতীয় সিনেমায় চুম্বনের দৃশ্য পশ্চিমী সিনেমার তুলনায় নিতান্তই বিরল। সত্যজিৎ দুটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই এই শরীরী অন্তরঙ্গতা ব্যবহার করেছেন। নিখিলেশ এবং সন্দীপ দুজনেই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে চুম্বন করে বিমলাকে। যৌনতার ঈষদুচ্চ পর্দার সুরটিকে গোড়াতেই ধরিয়ে দেবার জন্যও ওই জ্যাকেট বদলানোর দৃশ্যটির প্রয়োজন ছিল। এই সুরটিকে বহতা রাখবার জন্যই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন বিমলার পোশাক বদলানো, নিখিলেশ বিমলার শয্যাদৃশ্যের অন্তরঙ্গতা, নিখিলেশের আলিঙ্গন ও চুম্বনের আবেদন ইত্যাদির। ব্যবহার করেছেন সন্দীপের লম্পট দৃষ্টি, আয়নায় বিমলার মুখের ত্রিখণ্ডিত প্রতিফলনে প্রায় বাঁধভাঙা কামনার অভিব্যক্তি, সমস্ত চলচ্চিত্র জুড়ে তার পোশাকের লাল, হলুদ, কমলা ও নীল রঙ প্রভৃতি চিহ্নক (signifier)। শয়নকক্ষের সাতটি দৃশ্য আছে এই ছবিতে। এই দৃশ্যগুলিতে আমরা

লক্ষ করি পরিচালক কেমন চেষ্টা করেছেন নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য সম্পর্কে সাম্প্রতিকতার একটা ধরন আনার। উপন্যাসের বিমলার মত এই বিমলা কিন্তু স্বামীকে পুজো করে না। এখানে বরং হাসি-ঠাট্টায় কথার পিঠে চটজলদি কথায় স্বামী-স্ত্রীর সমানে সমানে এক সম্পর্ক। হাত ধরাধরি করে তারা প্রেমের গান গায়। সাম্প্রতিক এই ধাঁচটি সন্দীপ বিমলা সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রেখেছেন সত্যজিৎ। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, সশরীরে এসে হাজির হবার আগে থেকেই কিন্তু সন্দীপের পরোক্ষ উপস্থিতি বজায় রাখেন পরিচালক চলচ্চিত্রে। শুধু নিখিলেশের মুখ থেকেই যে সাতকাহন শুনি আমরা সন্দীপের সম্পর্কে তানয়, এই দম্পতির শোবার ঘরে সন্দীপের একখানি বাঁধানো ফটোও রাখা থাকে গোড়া থেকে। উপন্যাসে বিমলা বিশ শতকের গোড়ার সামাজিক রীতি অনুযায়ী সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করে মধ্যাহ্ন-ভোজে। সত্যজিতের বিমলা আমাদের কালের যে-কোনও মধ্যবিত্ত মহিলার মত সন্দীপকে নেমন্তন্ন করে চা-খাবার জন্য, আওড়ায় 'চায়ের সঙ্গে একটা কিছু মুখে দিতেই হবে আপনাকে' জাতীয় নিতান্তই সাম্প্রতিক সামাজিকতার বুলি। সন্দীপের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতাও গড়ে ওঠে হুবহু আজকের ধরনে। উপন্যাসের বিমলার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সন্দীপ প্রথমবার তার হাত ধরার পর। সত্যজিতের 'ঘরে-বাইরে'-তে বাইরের বসার ঘরে দরজা যেখানে হাট করে খোলা আর যেকোনো মুহূর্তে যে-কেউ যেখানে এসে পড়তে পারে সেখানে সন্দীপ চুম্বন করার পর আবেশে বিহ্বল বিমলা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘরের সাতটি দৃশ্যের পাশাপাশি বিমলা-সন্দীপকে নিয়ে সাতটি দৃশ্য রেখেছেন পরিচালক এই ছবিতে। সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব এইভাবেই সাম্পাতিক করে ফেলেছে বিশ শতকের গোড়ার প্রেক্ষাপটে ন্যস্ত নারী-পুরুষের সম্পর্কটিকে, চারিয়ে দিয়েছে এক অতি সাম্পতিক যৌনতা সম্পর্কটির পরতে পরতে।

তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিমলা-চরিত্রটির কপালেই জুটেছে সবচেয়ে বেশি ভুর্ভোগ। সন্দীপের অগ্নিবর্ষী ভাষণ উপন্যাসে যেমন চলচ্চিত্রেও তেমনি বিচলিত করে বিমলাকে। কিন্তু উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সন্দীপ আবির্ভূত হবার আগেই বিমলার দাম্পত্য জীবনে অপূর্ণতাবোধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে এদের দুজনের মতান্তরের অবতারণার মাধ্যমে একটি পূর্বাভাস দিয়ে আমাদের প্রস্তুত করে নেন আসন্ন দুর্যোগের জন্য। সন্দীপ আসার আগে সত্যজিতের বিমলাকে কিন্তু বিবাহিত জীবনে খুবই পরিতৃপ্ত বলে মনে হয় আমাদের। তাঁর নিখিলেশও শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ থেকে দূরগামী। সে যথেষ্ট সুপুরুষ। অতএব স্বামীর চেহারা নিয়ে খেদ অনুভব করার কোনও সুযোগ নেই এই বিমলার। জাতীয়বাদী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়েও এদের দুজনের মধ্যে মত-ভেদের বিশেষ কোনও প্রমাণ নেই ছবিটিতে। তবুও সত্য-জিতের বিমলা সন্দীপের বক্তৃতা শুনে সম্মোহিত হয় এবং এই মুগ্ধতার আসল চেহারাটি যে কী তা তিনি অতি যত্নে স্পষ্ট করে তোলেন আমাদের কাছে। সেই রাতে শোবার ঘরে বিমলাকে দিয়ে তিনি একটি উদাস-বিধুর ইংরেজি গান গাওয়ান। তারপরে সে, যদিও স্বামীর অনুরোধে, একটি আদি-রসাত্মক টপ্পা ধরে এবং যে কলিটিতে মদনদেবের উল্লেখ আছে সেই কলিটি গাইতে গাইতে দেরাজ-আলমারির ওপরে রাখা সন্দীপের ফটোগ্রাফটি হাতে তুলে নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। দৃশ্য ও শ্রব্য উভয় চিহ্নের (sign) সাহায্যে বিমলার মানসিক অবস্থাটি পরিচালক পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন আমাদের।

উপন্যাসে যে বিমলা আগে স্বামীর শত অনুরোধেও বাইরে বেরোতে চাইত না, সন্দীপের বক্তৃতা শোনার পর সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে থাওয়াতে চায় সন্দীপকে। বিমলার এই পরিবর্তনে নিখিলেশ সেদিন খানিক অবাক হয়েছিল। আমন্ত্রিত সন্দীপ আসার পর স্বামীর ডাক পেয়ে জীবনে প্রথম অন্তঃপুর ছেড়ে বিমলা এসে বেরিয়ে আসে বাইরে এক পরপুরুষের সামনে। এই বাইরে বেরিয়ে আসা যে শুধুমাত্র ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোনো নয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় তার প্রবল ইঙ্গিত রয়েছে। সত্যজিৎ কিন্তু বিমলার এই ঘর থেকে বাইরের ঘরে যাওয়াটুকুর ওপরেই আরোপ করেছেন যাবতীয় গুরুত্ব। প্রসঙ্গত, চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্যেই বিমলাকে অন্দরের বারান্দায় কেশ-চর্চারত দেখিয়েই পরদৃশ্যে তাকে দেখিয়েছেন বাড়ির বাইরে নদীবক্ষে বজরায়, অবশ্যই স্বামী সমভিব্যাহারে। অর্থাৎ, ঘরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বিমলাকে আমাদের দেখা হয়ে যায় ছবির শুরুতেই। যাইহোক, বিমলার বাইরে বেরোনোর দৃশ্যটির সিংহভাগের সংস্থান করেন তিনি অন্তঃপুর ও বাইরের মহলের মধ্যবর্তী সংযোজক লম্বা টানা বারান্দায়। ছবিতে দেখানো এই বারান্দাটি যেন চলচ্চিত্রের নামের দুটি শব্দের

মধ্যবর্তী সংযোজক 'হাইফেন'-চিহ্নটিরই দৃশ্যরূপ। তাঁর বিমলা নিখিলেশের হাত ধরে পাশাপাশি হেঁটে এই লম্বা বারান্দাটি পেরিয়ে ভেতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে গিয়ে পৌঁছায়। এই ঘটনাটিকে দৃশ্যায়িত করেছেন সত্যজিৎ বিস্তারিতভাবে। সাউণ্ড ট্রাকে আবহ-বাজনার সঙ্গে মেশানো শাড়ির মৃদুঘর্ষণ জনিত শব্দ আর সেই সঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ ফ্রেমের শ্লথ গতিতে (slow motions) ধরে-রাখা দৃশ্যে সকালের উজ্জ্বল রোদের আলোয় ভাস্বর হাত-ধরে পাশাপাশি বিলম্বিত লয়ে প্রায় উড়ে চলে সত্যজিৎ রায়ের নিখিলেশ-বিমলা ঘর থেকে বাইরে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সত্ত্বেও সত্যজিতের বিমলাকে আমরা কখনোই শুনিনা নিখিলেশ বা সন্দীপ কারোর সঙ্গেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে। স্বদেশিকতা প্রসঙ্গেও তাকে তেমন কিছু বলতে শুনিনা যা থেকে বুঝে নেওয়া যায় একটা শিক্ষিত আধুনিক ভাবনা অন্তত তার আছে। বিমলার সাজপোশাক আর পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক—এই দুয়ের মধ্যে সাম্প্রতিকতাকে ধরতে চান বটে সত্যজিৎ কিন্তু তার মানসিক গড়নের মধ্যে রাখেন না আধুনিকতার সামান্যতম লেশ। প্রকৃতপক্ষে, বিমলাকে তিনি দেননি ব্যক্তিত্বের এতটুকুও বিশিষ্টতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' চলচ্চিত্রায়নের বেলায় তিনি কিন্তু চারুলতার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলার জন্য মন্দা-চরিত্রটিকে ব্যবহার করে-ছিলেন নিপুণভাবে। 'চারুলতা'-র মন্দার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে চারুর হাই-তোলা, নন্দা সস্তা রসিকতা করলে চারুর তাকে ধমকানো, অমল আর চারু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু করলে মন্দার ঘুমিয়ে-পড়া মন্দা যাতে ব্যাঘাত না-ঘটাতে পারে আলোচনায় তাই অমল আর চারুর উঠে গিয়ে বাগানে বসা ইত্যাদির মাধ্যমে চারুলতার চরিত্রটিকে তিনি স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। 'ঘরে-বাইরে'-তেও তিনি তা পারতেন করতে —পালটা-চরিত্র হিসেবে বিধবা বড় জায়ের চরিত্রটি ছিল তাঁর নাগালের মধ্যেই। কিন্তু, সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রকৃতির এই দুটি নারীর সম্পর্কের কেন্দ্রে প্রবেশ করার কোনও চেষ্টাই করেন না সত্যজিৎ। পরিধি-রেখায় বিচরণ করেই ক্ষান্ত হন তিনি। উপন্যাসের বিমলা যখন সন্দীপের সঙ্গে অবৈধ-সম্পর্কের আলোড়নে বিস্রস্ত—স্বামীর সঙ্গে যখন তৈরি হয়ে গেছে এক প্রায়-অনতিক্রম্য দূরত্ব তখন রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিয়েছেন এক বাঙ্ময় প্রতিমার—শোবার ঘরে নিখিলেশের ছবির সামনে পড়ে আছে শুকিয়ে কালো হয়ে-যাওয়া কিছু ফুল। হঠাৎই একদিন বিমলার চোখে পড়ে যায় এটা। একই উদ্দেশ্যে সত্যজিৎ ব্যবহার করেন অন্য এক চিহ্ন। দূর থেকে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসে ক্যামেরা দেখায় যে চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো সিঁদুরের মাঝখানে ঢাকনা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে বিমলার সিঁদুরের কৌটোটি। সিঁদুরের ব্যবহার স্ত্রীমাত্রেই পাতিব্রত্যের লক্ষণ—এই সিদ্ধান্তটি মাথায় রাখলে ধন্দ হয় তবে কি সত্যজিৎ এখন দুষছেন বিমলাকেই তার অবিশ্বস্ততার জন্য! বিমলাকে তিনি বারবার দাঁড় করিয়েছেন আয়নার সামনে কিন্তু তার অন্তর্দাহকে প্রতিফলিত করার জন্য ব্যবহার করেন নি এই কায়দাটিকে একবারও। উপন্যাসের বিমলা যখন চেঁর পায় সন্দীপের সঙ্গে তার সম্পর্কটির বাঁক কোনদিকে তখন সে স্বীকার করে, 'আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে, তাঁকে শ্রদ্ধাও করিনে, এমনকি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি।···তবু আমার এই রক্তে মাংসে এই ভাবে ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগলো।'[১৪] চলচ্চিত্রের বিমলাকে এই সংকটে পড়তে হয় না। রবীন্দ্রনাথের বিমলার ব্যক্তিত্বই তার অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কারণ, আবার এই সংকটই তার সত্তাকে নতুন করে গড়ে তোলে। সত্যজিতের বিমলার এমন অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ার মত ব্যক্তিত্বই নেই। সন্দীপের স্বরূপ বুঝে ফেলার পর সে ফিরে আসে নিখিলেশের কাছে। তার স্বামী তাকে ক্ষমা করে বটে কিন্তু তার নির্ঘাতা পারেন না তাকে ক্ষমা করতে। সত্যজিৎ চরম শাস্তি দেন তাকে। দাঙ্গা-দমন করতে বেরিয়ে-যাওয়া নিখিলেশের জন্য যখন প্রতীক্ষারত বিমলা, রবীন্দ্রনাথ থেকে শেষবারের মত দূরে সরে গিয়ে, সত্যজিৎ তখন দেখান নিখিলেশের মৃতদেহ বয়ে আনা হচ্ছে বাড়িতে। শেষ দৃশ্যে, তিনি প্রথমে ক্লোজ-আপ পরে ট্রাক ব্যাক করে দেখান এরোতী সমস্ত চিহ্ন একে একে ঘুচে গিয়ে সাদা থানশাড়ি পরে ক্রমে কেমন বিধবা হয়ে যায় বিমলা।

এই আলোচনার উপসংহারে পৌঁছে বলা যায় যে রবীন্দ্র-নাথ তবু তাঁর সমসাময়িক কালের প্রচলন-নির্ভর লিঙ্গ-নির্মিতিকে ভেঙে নারীপুরুষের সম্পর্কের নতুন সম্ভাবনা-গুলিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সত্তর বছর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে দাঁড়িয়ে আরও অনেক যুক্তি-বাদী পরিপ্রেক্ষিতের সুবিধা নিয়েও—এই সত্তর বছরে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থান ও পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রভূত পরিবর্তন সত্ত্বেও সত্যজিৎ পারেননি রবীন্দ্র-

নাথ-ব্যবহৃত লিঙ্গ-নির্মিতি সম্বন্ধে একটি যথোপযুক্ত সমালোচনা সূত্রবদ্ধ করতে। তিনি কেবল নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাইরের থেকে একটি আপাত-আধুনিকতা আরোপ করে শেষপর্যন্ত কিন্তু পিছিয়ে যান এক উনিশ-শতকী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

সূত্র নির্দেশ :

১. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল (১৯৮০ ; পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ , ১৯৯০), পৃ. ১। এরপর থেকে 'অন্দরমহল'।

২. Ghulam Murshid, Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernisation, 1849-1905 (Rajshahi : Sahitya Samsad, Rajshahi University, 1983), p. 113. Henceforth 'R. D.' অনুবাদ নিবন্ধকারের।

৩. তদেব, পৃ. ১১৩।

৪. চিত্রা দেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা (১৯৮৪ ; পুনর্মুদ্রণ কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৭), পৃ. ২৫।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরে বাইরে (১৯১৬ ; পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী. ১৯৮০) পৃ. ১৪। এরপর থেকে 'ঘরে বাইরে'।

৬. সুতপা ভট্টাচার্য, সে নহি নহি (শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী রিসার্চ পাব্লিকেশন সেকশন, ১৯৯০), পৃ. ১০৬। এরপর থেকে 'সে নহি'।

৭. R.D., p. 124.

৮. তদেব, p. 73.

৯. তদেব, p. 219.

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পূর্ব ও পশ্চিম', রবীন্দ্ররচনাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১), ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৩। এরপর থেকে 'রর ১৩'।

১১. Sachin Sen, The Political Thought of Rabindranath (Calcutta : General Printers & Publishers Ltd., 1947), p. 76.

১২. Michele Barret & Mary McIntosh, The Anti-social Family (1982 ; rpt. London ; New Left Book, 1985), pp. 39, 81. Henceforth 'TAF'.

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরের' উপন্যাস সম্পর্কে উদ্ধৃতি চিত্রভাষ 'ঘরে-বাইরে' স্মরণ সংখ্যা, বিংশতি বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা (জানুয়ারী-জুন, ১৯৮৫), পৃ. ৯১। এরপর থেকে 'চিত্রভাষ'।

১৪. 'ঘরে বাইরে', পৃ. ৮।

১৫. John Stuart Mill, The Subjection of Women (1929 ; rpt. New York : Everyman's Library, 1977), p. 219.

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', 'র র' ১৩', পৃ. ১৪। এরপর থেকে 'ভা. বি' র-র ১৩।

১৭. TAF., p, 106.

১৮. ঘরে বাইরে, পৃ. ৬২।

১৯. তদেব, পৃ. ১০১।

২০. তদেব, পৃ, ১১।

২১. তদেব, পৃ, ৯।

২২. Llyod Fernando, "New Women" in the Late Victorian Novel (Pennsylvania ; The Pennsylvania University Press, 1977), pp. 2, 3.

২৩. ঘরে বাইরে, পৃ. ৫৪।

২৪. তদেব, পৃ. ২২।

২৫. তদেব, পৃ. ২২।

২৬. R. D., p. 50.—Women in late nineteenth century were allowed by Calcutta University to take up Political Economy instead of Mathematics. In those days it was believed that women were weak in Mathematics.

২৭. ঘরে বাইরে, পৃ. ৫৩।

২৮. তদেব, পৃ. ৫৮।

২৯. সে নহি, পৃ. ৫।

৩০. সৈয়দ আক্রম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১), পৃ. ২৮১। এরপর থেকে 'চেতনালোক ও শিল্পরূপ'।

৩১. ঘরে বাইরে, পৃ. ১২০।

৩২. চেতনালোক ও শিল্পরূপ, পৃ. ২৬৮।

৩৩. তদেব, পৃ ২৭৮।

৩৪. ঘরে বাইরে, পৃ. ১৭১।

৩৫. তদেব, পৃ. ১৯১।

৩৬. ভা. বি, র. র ১৩, পৃ. ২০।

৩৭. চিত্রভাষ, পৃ. ৬।—এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় শ্রী শঙ্খ ঘোষ 'ঘরে বাইরে'-র প্রথম সংস্করণে নামের মধ্যে যে একটি 'হাইফেন'-চিহ্ন ছিল এই তথ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু, উপন্যাসের মমার্থ এই সংযোজক চিহ্নের ব্যবহারের সমার্থক নয় বলেই বিশ্বাস এই নিবন্ধকারের। উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রেও স্বয়ং লেখকের মতানুসারে নামকরণ হয়েছিল The Home and the World। রবীন্দ্ররচনাবলীর বহুল-প্রচলিত জনপ্রিয় সংস্করণেও এই সংযোজক চিহ্নকে গ্রাহ্য করা হয়নি।

৩৮. সত্যজিৎ রায়, 'ঘরে বাইরে : চিত্রনাট্য', এক্ষণ (শীত-বসন্ত, ১৯৮৪), পৃ. ৩৪-১০৮।

৩৯. চিত্রভাষ, পৃ. ১০৪।

৪০. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, 'ঘরে-বাইরে : ছবি তৈরীর নেপথ্য কাহিনী', এক্ষণ, পৃ. ১১২।

৪১. চিত্রভাষ, পৃ. ১০৪।

৪২. Marie Seton, Portrait of a Director : Satyajit Ray (Delhi : Vikas Publications, 1972), p. 70.

৪৩. চিত্রভাষ, পৃ. ৭।

৪৪. ঘরে বাইরে, পৃ. ৬৭।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা রত ড. অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু মননশীল লেখিকাই নন, গ্রুপ থিয়েটারের একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী হিসাবেও তিনি অর্জন করেছেন প্রায় আঠার বছরের অভিজ্ঞতা। বর্তমানে তিনি নিয়মিত অভিনয় করেন 'থিয়েট্রন' নাট্যসংস্থায়।

মাটি

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

হিউমাস

আগে বলা হয়েছে যে মাটির সঙ্গে জৈব পদার্থ ওতপ্রোত ভাবে মিশে থাকার দরুন কালো, বাদামি ও ছাই রঙ-এর মাটি দেখতে পাই। মাটির গঠনকে দৃঢ় ও সুস্থির করতে প্রয়োজন হয় জৈব পদার্থের, সে কথাও বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে শিলাচূর্ণ থেকে মাটি তৈরির ক্ষেত্রেও জৈব পদার্থের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই সব কারণে জৈব পদার্থের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক।

জৈব পদার্থ মূলত কতগুলি বৃহদণু কার্বন যৌগের সমষ্টি। মাটির জৈব পদার্থের উৎস প্রধানত উদ্ভিদ এবং জীবাণুজগৎ। গাছের পাতা, কচি শাখাপ্রশাখা, শিকড়, ঘাস, খড়, শেওলা ইত্যাদি মাটির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হতে পারে। এদের মধ্যে কোন কোন অংশ, যেমন ঘাস, খড় ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। তা ছাড়া পচানো জৈব পদার্থের কম্পোস্ট গোবর জৈবসার হিসাবে মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। বৃহদণু কার্বন যৌগগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে নাইট্রোজেন ও পটাশ, অল্পপরিমাণ ফসফরাস ও সালফার এবং অতিশয় অল্প পরিমাণ কয়েকটি ধাতুর অণুখাদ্য। এরা সবাই উদ্ভিদের এবং প্রাণীদের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। জৈব পদার্থ থেকে সরাসরি উদ্ভিদরা এইসব পুষ্টিদ্রব্য আহরণ করতে পারে না। মাটিতে অবস্থিত অনেকগুলি জীবাণু এদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে। এই প্রকার বিক্রিয়াদির ফলে জীবাণুগুলি যেমন সংখ্যায় বহুগুণ বাড়ে তেমনি বহু-সংখ্যক জীবাণু মৃত্যুও বরণ করে। তাদের দেহাবশেষ মাটির সঙ্গে মিশে জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে। এই সব জীবাণুর বিস্ময়কর কীর্তিকাহিনীর কিছু পরিচয় জানা আবশ্যক।

সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে ক্লোরোফিল-এর সাহায্যে উদ্ভিদরা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় যৌগ তৈরি করে। উদ্ভিদ দেহে ক্রমশ ক্ষুদ্র শর্করা থেকে কমবেশি ভরযুক্ত বৃহদণু, যথা হেমিসেল্যুলোজ, সেল্যুলোজ ইত্যাদি তৈরি হয়। তৈরি হয় লিগনিন, ট্যানিন ও অন্যান্য ফিনল যৌগ, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং নাইট্রোজেন সম্বলিত প্রোটিন যৌগ সমষ্টি। তা ছাড়া থাকে কতগুলি অজৈব খনিজদ্রব্য। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে আনুপাতিক পরিমাণ জানা গেছে। সাধারণভাবে আনুপাতিক হিসাবে এইরূপ : সেল্যুলোজ 20—30% হেমিসেল্যুলোজ 10—30% ; লিগনিন 10—30% প্রোটিন 1—10% ; স্নেহজাতীয় পদার্থ 1—8%।

মাটির জীবাণুরা প্রধানত শর্করা জাতীয় পদার্থগুলিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। ফলে, ঐ সব জটিল যৌগগুলি ভেঙে গিয়ে অনেকরকম ক্ষুদ্রভরযুক্ত অণু তৈরি হয়। ভাঙার অন্তিম পর্যায়ে পাওয়া যায় প্রধানত কার্বন ডাই-অকসাইড ও জল। এই সকল বিক্রিয়ার ফলে বহুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। জীবাণুরা তাদের বংশবৃদ্ধির কাজে এই শক্তি ব্যবহার করে। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভাঙার কাজও দ্রুত-গতিতে বাড়ে। প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থও ভেঙে প্রচুর ক্ষুদ্রভরযুক্ত অণু তৈরি হয়। এছাড়া নতুন ধরনের যৌগও তৈরি হয়। লিগনিনকে জীবাণুরা সম্পূর্ণ ভাঙতে পারেনা বটে, কিন্তু আংশিক ভাঙা লিগনিন এবং ট্যানিন ও ফিনল জাতীয় যৌগের সঙ্গে নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে কতগুলি জটিল যৌগ তৈরি করে। এরাই মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে হিউমাস রূপে অবস্থান করে। সাধারণত মাটির জীবাণুরা এই হিউগাসকে ভাঙতে পারে না। মাটির রংএরও বৈচিত্র্য গঠনের দৃঢ়তা ও সুস্থিতি নির্ণয় করে হিউমাসের পরিমাণ ও প্রকৃতি। মাটির মিহি কণাগুলি হিউমাসের সঙ্গে বন্ধনযুক্ত থাকে বলে জল অথবা বায়ুর প্রভাবে স্থানচ্যুত হয় না, অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। হিউমাসযুক্ত মাটির জলধারণের ক্ষমতাও প্রচুর।

জৈব পদার্থের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কার্বন (C)

ও নাইট্রোজেন (N)-এর পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জৈব পদার্থে C/N অনুপাত যদি 30-র বেশি হয় তাহলে প্রথমদিকে জীবাণুরা বাতাসের অথবা মাটিতে অবস্থিত নাইট্রোজেনকে জৈব যৌগ রূপে অলভ্য অবস্থায় আবদ্ধ করে। কিন্তু C/N অনুপাত ক্রমশ কমতে থাকলে জীবাণুরা জৈব পদার্থ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অলভ্য নাইট্রোজেনকে লভ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে। C/N অনুপাত 20—30 হলে জীবাণুরা সর্বাধিক ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। C/N অনুপাত 15-র কাছাকাছি অবস্থায় নাইট্রোজেন জৈব যৌগে আবদ্ধ হয় না। তার পরিবর্তে জৈব যৌগে আবদ্ধ নাইট্রোজেন অজৈব অবস্থায়, যেমন অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট-এ রূপান্তরিত হয়। উষ্ণমণ্ডলের উচ্চতর তাপমাত্রার জৈব পদার্থ দ্রুত-গতিতে ভাঙে। তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ভাঙার হার শ্লথ হয়ে পড়ে। যখন জৈব পদার্থের C/N অনুপাতক্রমে 10—12 হয়ে যায়, তখন আর জীবাণুরা তাকে ভাঙতে পারে না। সেই অবস্থায় জৈব পদার্থ পরিণত হয় হিউমাস-এ। বলা হয়েছে যে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং তাদের বর্জ্যপদার্থ ও জীবাণুদের দেহাবশেষ জৈব পদার্থের উপাদান। জীবাণু এদের ভেঙে ভেঙে যে হিউমাস তৈরি করে, তার রাসায়নিক সংযুক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আশ্চর্যের বিষয় যে মূল জৈব পদার্থ বিভিন্ন ধরনের হলেও জীবাণুর দ্বারা প্রায় একই রকম হিউমাস তৈরি হয়। এমন কি স্থান, কাল, মাটির প্রকৃতি ইত্যাদির বৈষম্য সত্ত্বেও হিউমাস-এর পরিমাণগত পার্থক্য থাকে বটে কিন্তু গুণগত পার্থক্য খুবই কম। অর্থাৎ হিউমাসের মত জটিল জৈব যৌগসমষ্টি তৈরির কাজে জীবাণুদের ক্রিয়া-কুশলতাই প্রাধান্য পাচ্ছে। কম তাপমাত্রা ও যথোপযুক্ত বারিপাত অবস্থার জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত হয় এবং অধিক পরিমাণে হিউমাস তৈরি হয়।

উষ্ণমণ্ডলের পরিবেশে জৈব পদার্থ দ্রুত হিউমাসে পরিণত হয় বটে, কিন্তু বেশি পরিমাণে জমতে পারে না। সেই কারণে বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে বিভিন্নরকম জৈব পদার্থ অধিক পরিমাণে মাটিতে প্রয়োগ করতে হয়। একমাত্র তা হলেই চাষের জমিতে হিউমাসের মাত্রা যথেষ্ট বাড়তে পারে। আর এই জন্য বহুল পরিমাণে গোময়জাত গোবরসার এবং সবুজসার ব্যবহারের রীতি বহুকাল থেকে প্রচলিত। শস্যাদির বর্জ্য অংশের মধ্যে শিকড়, বিশেষ করে গভীরগামী শিকড়, মাটির সঙ্গে অনায়াসে মিশে যেতে পারে বলে জৈব-পদার্থ হিসাবে সুস্থিত হিউমাস তৈরির কাজে শিকড় অধিকতর কার্যকরী। শিম জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে সুপার-ফসফেট প্রয়োগের ফলে সামগ্রিকভাবে জৈব পদার্থের পরিমাণ যেমন বাড়ে, শিকড়ও বিস্তৃতি লাভ করে। এই কারণে ফসফেট সহযোগে শিমজাতীয় শস্যাদি জৈবপদার্থ হিসাবে বিশেষ উপযোগী।

জীবাণু ব্যতীত আর যে সব প্রাণী মাটির হিউমাসের মাত্রা বাড়াতে পারে তাদের মধ্যে কেঁচো জাতীয় প্রাণী অন্যতম। জৈব পদার্থযুক্ত মাটি কেঁচোর পাকস্থলীতে রূপান্তরিত হয় হিউমাস সম্পৃক্ত মাটিতে। কাদামাটিকে দানাবদ্ধ অবস্থায় রূপান্তরিত করতে কেঁচোর জুড়ি নেই। জীবাণু এবং কেঁচোর কার্যকারিতা বিশেষরূপে নির্ভর করে মাটির প্রশমিত (না অম্ল না ক্ষার) অবস্থা এবং ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতির উপর।

হিউমাসের রাসায়নিক প্রকৃতি

নানাবিধ জৈব পদার্থের উপর জীবাণুদের আক্রমণের ফলে যে অন্তিম পদার্থটি পাওয়া যায়, তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে থাকে প্রায় অবিকৃত স্নেহজাতীয় পদার্থ (লিপিড) এবং শর্করা শ্রেণীর কিছু নাতিবৃহৎ এবং বৃহদণু যৌগ (পলিস্যাকারাইড)। দ্বিতীয় ভাগে থাকছে জীবাণুর দ্বারা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত কতগুলি বৃহদণুযৌগের সমষ্টি। প্রথম শ্রেণীর পরিমাণ প্রায় 10-15% এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিমাণ প্রায় 85-90%। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃহদণুগুলিই হিউমাসের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এদের মৌলবিশ্লেষণে পাওয়া যায় কেবল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। কিন্তু এটিকে একটি বিশুদ্ধ রাসায়নিক যৌগ বলা যায় না, বরং বলা যায় একাধিক বিভিন্ন রাসায়নিক সংযুক্তিসম্পন্ন যৌগের সমষ্টি। এতই জটিল যে এদের প্রকৃত সংযুক্তি এবং রাসায়নিক গঠন এখনও জানা যায়নি। তবে অনুমান করার মত তথ্য আছে। তা থেকে বলা যায় যে হিউমাসের মধ্যে আছে অনেকগুলি অ্যারোমেটিক রিং ও অ্যালিফেটিক শৃঙ্খলের সহযোগে বিভিন্ন আণবিক ভরযুক্ত বৃহদণুযৌগ। অ্যারোমেটিক রিং-এর কোথাও কোথাও —OH ও —COOH গ্রুপ যুক্ত হয়েছে। হিউমাসের আম্লিক প্রকৃতি এই দুটি গ্রুপের জন্য দায়ী। অ্যালিফোটিক অংশেও —COOH গ্রুপ যুক্ত হতে পারে। এই দুটি গ্রুপ আয়নিত হওয়ার ফলে হিউমিক অ্যাসিড তৈরি হয়। H+ আয়নের সংখ্যা যত বেশি, অম্লত্ব তত বেশি। তবে অজৈব অঙ্গের

তুলনায় জৈব অঙ্গের তেজ অনেক কম। তাছাড়া, মাটিতে হিউমাস তথা হিউমিক অ্যাসিডের পরিমাণ সাধারণত 1-5 শতাংশের বেশি হয় না। শীতোষ্ণমণ্ডলের মাটিতে 5 শতাংশের বেশিও হতে পারে। ভারতের মত উষ্ণমণ্ডলের মাটিতে 1 শতাংশেরও কম হিউমাস থাকে। বিভিন্ন যৌগের সমষ্টি হলেও হিউমাসের গড় C / N অনুপাত 10-12-এর কাছাকাছি অবস্থান করে।

জৈবপদার্থ বা হিউমাসের পরিমাণ নির্ণয় করার পদ্ধতি এইরূপ : মিহিমাটির নমুনার সঙ্গে সালফ্যুরিক অ্যাসিড ও পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণের মিশ্রণ বিক্রিয়া করলে জৈব পদার্থ জারিত হয়। বাড়তি ডাইক্রোমেট-এর পরিমাণ জানা যায় ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে টাইট্রেট করে। এই থেকে পাওয়া যায় জারিত করতে কী পরিমাণ ডাইক্রোমেট লাগল। তা থেকে কার্বনের শতাংশ হিসাব করে 1.72 সংজ্ঞার দ্বারা গুণ করে পাওয়া যায় জৈব পদার্থ অথবা হিউমাসের শতাংশ। এই পরীক্ষার শেষে মূল মাটির প্রকৃতি বদলে যায়। তাকে বজায় রেখে জারিত করতে হলে মৃদুজারক হাইড্রোজেন পার-অকসাইড ব্যবহার করা হয়। অনধিক 110° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে জারণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যায়।

হিউমাসের প্রকৃতি জানতে হলে তাকে মাটি থেকে পৃথক করা দরকার। এর জন্য পদ্ধতিটি এমন মৃদু হতে হবে যাতে হিউমাসের কোনরকম রাসায়নিক পরিবর্তন না ঘটে। ইথার-অ্যালকোহল মিশ্রণ সহযোগে প্রথমত স্নেহজাতীয় পদার্থগুলি সরিয়ে দিয়ে মাটির নমুনাটিকে 0·1N HCL-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ছেঁকে নেওয়া হল। উদ্দেশ্য যাতে মাটিস্থিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন দূরীকৃত হয়ে যায়। অতিরিক্ত HCL ধুয়ে ফেলে মাটির নমুনাটিকে 0.5 N সোডিয়াম কার্বনেট অথবা 0·1N সোডিয়াম হাইড্রকসাইড দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করা হল। এর ফলে মাটিতে আবদ্ধ হিউমাস কোনরকম কণা রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। অপেক্ষাকৃত মোটা দানার মাটি পড়লে উপর থেকে কলয়ড-রূপী Na-হিউমাসকে ঢেলে নেওয়া হল। তাতে সামান্য HCL-এর দ্বারা অম্লকরণের সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় বাদামী রংএর একটি অংশ থিতিয়ে পড়ল, কিন্তু একটি হালকা রংএর অংশ কলয়ড রূপেই থেকে গেল। থিতিয়ে পড়া অংশটিকে বলা হয় হিউমিক অ্যাসিড এবং কলয়ডরূপী অংশটিকে বলা হয় ফাল্‌ভিক অ্যাসিড। এই দুটি অংশের কার্বন পরিমাণ যোগ করে দেখা গেল মূল মাটির কার্বন থেকে কিছু কম। অতএব কিছু অংশ মাটিতে রয়ে গেছে, ক্ষারীয় দ্রবণ তাকে পৃথক করতে পারে নি। এই দৃঢ় আবদ্ধ অংশটিকে বলা হয় হিউমিন। এর পরিমাণ বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন হতে পারে। এখানে বলা দরকার যে, যে-দুটি অংশ পৃথক করা গেল তারাও কোন নির্দিষ্ট যৌগ নয়, মূল হিউমাসের মতই কত-গুলি যৌগের সমষ্টি মাত্র। সম্ভবত হিউমিনের প্রকৃতিও অনুরূপ। সাধারণত এই দুটি অংশের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ থেকেই মূল হিউমাসের পরিচয় লাভ করা হয়। এদের কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাতের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই, কিন্তু হিউমিক অ্যাসিডের গড় আণবিক ভর ফাল্‌ভিক অ্যাসিডের তুলনায় কিছু বেশি। সম্ভবত হিউমিনের আণবিক কয়েকগুণ বেশি, যার ফলে তাকে পৃথক করা সম্ভব হচ্ছে না। মূল হিউমাসের নাইট্রোজেনের পরিমাণের সঙ্গে হিউমিক ও ফালভিক অ্যাসিডের নাইট্রো-জেনের পরিমাণ মেলাতে গিয়ে দেখা গেল যে হিউমিন অংশে বেশ কিছু নাইট্রোজেন আবদ্ধ আছে। হিসেব করে দেখা গেল যে এই আবদ্ধ নাইট্রোজেনের পরিমাণ আমাদের কল্পনার বাইরে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে হিউমিন নাইট্রো-জেনকে মুক্ত করতে পারলে 20-40 বছর ধরে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। উদ্ভিদ জগতের আবির্ভাবের পর থেকে কয়েক কোটি বছর ধরে জীবাণুর সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেন বছরের পর বছর ধরে চক্রাকারে ঘুরছে, তার ফলে বিরাট পরিমাণ নাইট্রোজেন জৈব পদার্থের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছে। হয়ত ভবিষ্যতে কোন নূতন ধরনের জীবাণুর দ্বারা এই আবদ্ধ নাইট্রোজেনকে মুক্তি দান করে ব্যবহারের উপযুক্ত রূপে পাওয়া যাবে। আশা করা যায় এইরকম আবদ্ধ নাইট্রোজেনের মুক্তি প্রচেষ্টায় জীবাণু বিজ্ঞানীরা তৎপর হবেন।

জীবদেহের অন্যান্য বৃহদণুযৌগাদির মত হিউমিক ও ফাল্‌ভিক অ্যাসিড একাধিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে পারে। যেমন, মাটির কাদাকণাগুলিকে দানাবদ্ধ অবস্থায় পরিণত করা, জল ধরে রাখা, জীবাণুদের সাহায্যে তৈরি অ্যামোনিয়া অণুকে ধরে রাখা অণুখাদ্য যথা, Zn, Co, Mn, Cu ইত্যাদিদের ধরে রাখা এবং প্রয়োজন মত উদ্ভিদের শিকড়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এমনিভাবে ধরে না রাখলে অতি অল্প মাত্রায় বিদ্যমান অণুখাদ্যগুলি হারিয়ে যেত। সামান্য পরিমাণে হলেও মাটির মিহিকাদাকণাগুলিকে হিউমাস যে

ভাবে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে তেমনটি আর কোন রকমে সম্ভবপর নয়। কাঁচা জৈব পদার্থের পচন থেকে শুরু করে অন্তিম হিউমাসে রূপান্তর একটি বিস্ময়কর ও রহস্যাবৃত ঘটনা। যে-জীবাণুদের সহযোগিতায় এই ক্রিয়াকর্ম অবিরত সম্পাদিত হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে কিছু না বললে তাদের প্রতি অবহেলা করা হবে।

জীবাণুদের কাহিনী

মাটির জৈবসম্পদ বৃদ্ধি করতে এবং গতিশীলতা বজায় রাখতে জীবাণুদের অবদান অপরিসীম। বিপুল সংখ্যক ছোট বড় নানারকমের জীবাণু মাটিকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে এবং মাটিকেও বাঁচিয়ে রেখেছে। এইসব জীবাণুদের উৎস উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ উভয়ই। যেমন উদ্ভিদ জগতের খুব বড় জীবাণু হল শিকড় সমষ্টি। ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জীবাণুদের মধ্যে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ব্যাকটিরিয়া, ফানজাই, অ্যাকটিনোমাইসেটিস ও অ্যালগি। এদের প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি উপশ্রেণী। প্রাণিজগতে আছে বড় জীবাণুদের মধ্যে কেঁচো, ছুঁচো, গুবরে পোকা, পিঁপড়ে ইত্যাদি এবং ক্ষুদ্র জীবাণুদের মধ্যে প্রোটোজোয়া, নেমাটোড ইত্যাদি। প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে আছে শত সহস্র প্রজাতি। প্রাণ বৈচিত্র্যের এমন নিদর্শন খুবই বিরল। দেহায়তনের তুলনায় প্রাণিজগতের জীবাণুরা খুবই ছোট কিন্তু সংখ্যায় এরা এত বেশি যে মাটির জৈবসম্পদের অধিকাংশই উদ্ভিদ শ্রেণীর জীবাণুদের দ্বারাই তৈরি হয়। জৈবসম্পদ তৈরির কাজে উদ্ভিদের মধ্যে শিকড়ের অবদান তুচ্ছ নয়। মাটিস্থ শিকড় থেকে প্রতি হেকটারে কমপক্ষে 3-5 কেজি শুকনো জৈবসম্পদ তৈরি হয়। প্রতিগ্রাম ওজনের মাটিতে ব্যাকটিরিয়া, ফানজাই, অ্যাকটিনোমাইসেটিস ও অ্যালগিদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ থেকে কয়েক কোটি পর্যন্ত হতে পারে। উদ্ভিদের শিকড়ের সন্নিকট মাটিতে (যাকে রাইজোস্ফিয়ার বলা হয়) এদের সংখ্যা 80-250 গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। অতএব রাইজোস্ফিয়ারে জীবাণুদের কার্যকলাপ অসামান্য দ্রুত গতি লাভ করে। এদের থেকে উদ্ভূত হয় প্রচুর জৈব সম্পদ। শুকনো অবস্থায় হেকটার প্রতি 15—900 কেজি পর্যন্ত জৈব সম্পদ তৈরি হয়। যেমন তৈরি হচ্ছে তেমনি প্রতিনিয়ত ভাঙছে জীবাণুদের খাদ্যের যোগান দিতে। প্রাণিজগতের বড় জীবাণুদের মধ্যে মাটির রূপান্তর কার্যে সর্বাধিক অবদান হল কেঁচোর। প্রায় দুশ প্রজাতির কেঁচো প্রতি হেকটারে 30 টন মাটি তাদের শরীরে গ্রহণ করে এবং বর্জ্যবস্তুরূপে বের করে দেয়। তার ফলে মাটিতে ব্যাকটিরিয়া, হিউমাস, নাইট্রোজেন যৌগ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সুলভ ফসফরাস ও পটাশ মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। কেঁচোদের এই জাতীয় বিক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ব্যাকটিরিয়ার মত কেঁচোর কালচার মাটিতে প্রয়োগ করার প্রকল্প গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

তৈরি এবং ভাঙাই হল গতিশীল পদ্ধতির প্রকৃত লক্ষণ। আপাত নিরেট ও নির্জীব মাটিতে কী পরিমাণ জীবনের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ সংসাধিত হচ্ছে তা সহজে অনুমান করা যায় না। কয়েকটি প্রজাতি ছাড়া অধিকাংশ জীবনের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ পরিবেশ নির্ভর। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করতে যে সকল বস্তু ও শক্তি সম্পদ অত্যাবশ্যক তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জল, তাপ, অক্সিজেন, মাটির অম্লত্ব / ক্ষারত্ব, আলোক, খাদ্য, মাটির ভৌতিক ও রাসায়নিক অবস্থা। উপযুক্ত পরিমাণ জলের উপস্থিতিতে বায়ু চলাচল যে মাটিতে সহজ সেখানে অক্সিজেনবিলাসী ব্যাকটিরিয়া সংখ্যায় বাড়ে এবং কার্যকরী হয়। এই সব জীবাণু অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দেয়। বাতাসের অক্সিজেন যদি মাটিতে প্রবেশ করতে না পারে, তা হলে সঞ্চিত কার্বন ডাই-অক্সাইড জীবাণুদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

জলমগ্ন অবস্থায় বাড়ে অক্সিজেন বিদ্বেষী ব্যাকটিরিয়া। উভয় শ্রেণিভুক্ত জীবাণুদের অবদান নিজস্ব পরিবেশে মোটেই তুচ্ছ নয়। মাটি স্থিত জীবাণুরা সাধারণত 15—45° সে. তাপমাত্রার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে কিন্তু 37° সে. হল জীবননির্বাহের পক্ষে সর্বাধিক বাঞ্ছনীয়। সুতরাং শীতকালে জীবাণুদের সংখ্যা কমে, কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ে। অতএব গড়ে জীবাণুদের ক্রিয়াকলাপ মাটির উর্বরাশক্তি উচ্চমানে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

মাটির অম্লত্ব / ক্ষারত্বের উপর নির্ভর করে জীবাণুদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী প্রাধান্য পায় এবং সংখ্যায় বাড়তে পারে। যেমন, যে মাটির pH * মাত্রা 6.5—8.0 সেই মাটিতে নানাধরনের ব্যাকটিরিয়া অনায়াসে প্রভাব বিস্তার করে ও সংখ্যায় বাড়ে। অম্ল মাটিতে (pH – 4.5 – 6.5)

* H+ আয়নের ঘনত্ব [লিটার/মোল মাপে) = 10–pH pH = 7 হল না অম্ল না ক্ষার অবস্থা। 7-এর কম হলে অম্ল ও বেশি হলে ক্ষার।

ফানজাই প্রাধান্য পায় এবং তাদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। অম্লমাটিতে ব্যাকটিরিয়ার কার্যকারিতা ন্যূনতম। কিন্তু চূণ জাতীয় ক্ষার পদার্থ প্রয়োগ করে pH 6.5-এর উর্ধ্বে তুললে ব্যাকটিরিয়ারা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সংখ্যায়ও দ্রুতগতি বাড়ে।

অ্যালগি ব্যতীত অন্যান্য জীবাণুদের বেলা প্রত্যক্ষ সূর্যরশ্মি ক্ষতিকর। অ্যালগিদের ক্ষেত্রে সালোক সংশ্লেষ বিক্রিয়া বংশ বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করে।

সবরকম কার্বন যৌগই জীবাণুর খাদ্য। কার্বন যৌগ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তি নির্গত হয় জীবাণুরা তাকেই আহরণ করে তাদের নানাবিধ ক্রিয়া-বিক্রিয়া সমাধা করে। জৈব সার থেকে এবং পরিশেষে মাটি থেকে জীবাণুরা অন্যান্য পুষ্টি দ্রব্য আহরণ করে। মাটিতে একাধিক শ্রেণীর জীবাণুরা এক যোগে এমন ভাবে কাজ করে যেন একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক। কখন কখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়, সে অবস্থায় যে যে শ্রেণীর পক্ষে পরিবেশ অনুকূল তারাই প্রাধান্য লাভ করে।

জীবাণুরা মাটিতে কী কী কর্মে লিপ্ত

মাটিস্থিত জৈব পদার্থকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে বংশ বৃদ্ধি করাই যদি জীবাণুদের একমাত্র কাজ হত তা হলে তাদের সম্বন্ধে বেশি ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন হত না। জৈব পদার্থ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলি কাজে তারা লিপ্ত হয় যার মূল্য মাটির পুষ্টি সংরক্ষণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অপরিসীম। এদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন, বাতাস থেকে নাইট্রোজেনকে নানাপ্রকারে আহরণ ও আত্মস্থকরণ (নাইট্রোজেন ফিক্সেশন), নাইট্রোজেন, কার্বন, ফসফরাস এবং সালফারচক্র রচনা। এদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল হল নাইট্রোজেন সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি।

অ্যাজোটোব্যাকটার ও ক্লষ্টিডিয়াম জাতীয় জীবাণুরা বাতাসের নাইট্রোজেনকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে এবং নিজেদের দেহ গঠনে ব্যবহার করে। এদের মৃত্যুর পর দেহাবশেষ অন্য জীবাণুর দ্বারা অ্যামোনিয়া এবং পরিশেষে নাইট্রেট-এ রূপান্তরিত হয়। এই নাইট্রেট রূপেই উদ্ভিদ ও শস্যাদি নাইট্রোজেন আহরণ করে। দ্বিতীয় প্রকার নাইট্রোজেন আহরণকারী জীবাণু হল রাইজোবিয়াম। এরা থাকে শিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়দেশে অর্বুদ বা আব হিসাবে। শিকড় থেকে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে এবং বংশ বৃদ্ধি করে, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করে আত্মস্থ করে প্রোটিন যৌগের মাধ্যমে। শিমজাতীয় উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে চাষ করে দেওয়ার পরই মাটিস্থিত অন্য জীবাণুরা প্রোটিন যৌগকে ভেঙে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট তৈরি করে।

শেওলাজাতীয় নীল সবুজ অ্যালগি বাতাসের নাইট্রোজেন আহরণ করে এবং দেহস্থিত সায়ানো ব্যাকটিরিয়ার সহযোগে এবং CO_2 ও H_2O সংযোগে ক্লোরোফিলের সাহায্যে নীল সবুজ জৈব সম্পদ তৈরি করে। মাটিতে প্রয়োগ করলে অন্যান্য জীবাণুরা এই জৈব সম্পদকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিনজাত নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া ও পরিশেষে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। ধানের জমিতে জলীয় পরিবেশে পরিমিত ফসফরাস ও সামান্য পরিমাণ মলিবডেনাম অনুখাদ্যের উপস্থিতিতে অ্যালগি দ্রুত বাড়ে এবং নাইট্রোজেন আহরণ করে। শেওলাজাতীয় অন্য একটি প্রজাতি, অ্যাজোলা, এমনিভাবে নাইট্রোজেন আহরণ করে, কিন্তু তার জন্য সহযোগিতা দরকার ফানজাই জাতীয় জীবাণুর। অগভীর জলে পানার মত এরা আস্তরণ তৈরি করে এবং বাতাসের নাইট্রোজেন আহরণ করে।

এনজাইম

কী ধরনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাসের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া ও ধাপে ধাপে প্রোটিন যৌগে পরিণত হয় তার প্রত্যেকটি ধাপ সম্যক জানা নাই। তবে এই ধরনের জৈববিক্রিয়া সাধারণ চাপে ও তাপে সংঘটিত হয় কতগুলি জৈব অনুঘটকের দ্বারা। এদের বলা হয় এনজাইম। এনজাইমরা মূলত এক একটি প্রোটিন। তারা অনায়াসে আপাত দুঃসাধ্য বিভাজন ও সংযোজন ক্রিয়া সম্পাদন করে। নাইট্রোজেনেজ নামক এনজাইম নাইট্রোজেনের মত নিরেট অণুকে ভেঙে পারমাণবিক নাইট্রোজেন তৈরি করে। তারপর হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি সহজতর। প্রোটিন ভেঙে অ্যামোনিয়া তৈরি করতে একধরনের ফানজাই ও অ্যাকটিনোমাইমেটিস সাহায্য করে। তাদের দেহস্থিত প্রোটিনেজ এনজাইম এই কাজটি সম্পাদন করে। অ্যামোনিয়াকে জারিত করে নাইট্রোমোনাস ও নাইট্রোব্যাকটার, যার ফলে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং পরিশেষে নাইট্রেট তৈরি হয়। মাটিতেই থাকে সিউডোমোনাস এবং ব্যাসিলাস

জীবাণু, যারা উপযুক্ত এনজাইম সাহায্যে নাইট্রেটকে উল্টো পথে বিজারিত করে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত করে। এমনি করেই নাইট্রোজেন চক্র রচিত হয় এবং মাটিতে প্রতি-নিয়ত এই বিক্রিয়াগুলি চলছে।

জীবাণুদের সাহয্যে যে চক্রগুলি মাটিকে নিয়ত গতিশীল অবস্থায় রাখছে তাদের মধ্যে কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্রই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; তা ছাড়া আছে ফসফরাস ও সালফার চক্র। এই চক্রগুলির সাহায্যে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি দ্রব্যাদি প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত ও স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই চক্রগুলিকে সম্পূর্ণ করতে জীবাণু, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সবাইকে কোন না কোন বিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হচ্ছে। এদের মধ্যে নাইট্রোজেন চক্রের কথা বলা হল। অন্যান্য চক্রগুলির চিত্র নিম্নরূপ :

কার্বন চক্র

উদ্ভিদের মাধ্যমে ক্লোরোফিলের সাহায্যে ডাইঅক্সাইড হিসাবে কার্বন জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নানাবিধ শর্করা জাতীয় বৃহদণুযোগ তৈরি করে। এরা সব জমা হয় উদ্ভিদের ডালে, শিকড়ে, পাতায়, ফলে, ফুলে। প্রাণিজগৎ তাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। প্রাণীদের বর্জ্যবস্তু এবং উদ্ভিদের ঝরে পড়া পাতা, ফল ফুল ইত্যাদি মাটিতে জমা হয় এবং জীবাণুদের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে পুনরায় ডাই-অক্সাইড হিসাবে কার্বনে পরিণত হয়।

ফসফরাস চক্র

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে অবস্থিত কাইটিন, ফসফোলিপিড, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ইত্যাদি ফসফরাস যুক্ত জৈব যৌগ। অজৈব ফসফরাস যৌগ প্রধানত প্রাণীদের হাড়ে, দাঁতে এবং কোষমধ্যে বিরাজ করে। জীবাণুরা এইসব জৈব ও অজৈব ফসফরাসকে আবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে। মুক্ত অবস্থায় উদ্ভিদরা ফসফরাস গ্রহণ করে বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে জমা হয়। প্রাণীরা খাদ্য হিসাবে খেয়ে পুষ্টিসাধন করে এবং বর্জ্য হিসাবে মাটিতে ফিরে আসে অথবা মৃত প্রাণীদের দেহাবশেষ মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। জীবাণুরা পুনরায় তাদের মুক্ত করে, যাতে উদ্ভিদরা গ্রহণ করতে পারে।

সালফার চক্রও অনুরূপ। এখানে থায়োব্যাসিলাস ও সালফার ব্যাকটিরিয়ার প্রজাতিরা রূপান্তরিত করে নানারকম জৈব ও অজৈব সালফার যৌগকে।

উদ্ভিদ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে পুষ্টি আহরণ করে। বস্তুতপক্ষে শিকড়ের কাছাকাছি মাটিতে মাইকোরাইজা নামক একপ্রকার জীবাণু বসবাস করে যারা এই কর্মক্ষমতার জন্য দায়ী। তাদের সংখ্যা যাতে হ্রাস না পায় বা যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। বাতাসের নাইট্রোজেন আহরণ, মাটিতে সংরক্ষণ এবং নাইট্রেট রূপান্তর করার কাজে নানাধরনের জীবাণু লিপ্ত আছে। কার্বন, ফসফরাস ও সালফার চক্র চালু রাখতে আর এক ধরনের জীবাণুর দরকার হয়। অদ্রবণীয় অজৈব ফসফরাসকে উদ্ভিদের উপযোগী করতে আর একপ্রকার জীবাণু কাজ করে। সাধারণ ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে সেল্যুলোজ লিগনিন ইত্যাদি পদার্থকে ভাঙা খুবই কঠিন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ফানজাই, অ্যাকটিনোমাইসেটিস এদের অনায়াসে ভাঙতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রধানতঃ এরাই মাটিস্থিত সকল প্রকার জৈব পদার্থকে হিউমাসে রূপান্তরিত করে।

উপরে যা বলা হল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বাতাস, জল ও মাটিতে জৈবপদার্থের যে চক্রাকার জীবন-প্রবাহ সংঘটিত হচ্ছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে একমাত্র জীবাণুরাই। এই জীবাণুদের পরিবেশ সুস্থ এবং সুরক্ষিত না থাকলে তারা ত বিনষ্ট হবেই, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাহত হবে জীবন প্রবাহের ধারাবাহিকতা। জীবমণ্ডল নিষ্প্রয়োজন ভেবে মানুষ যদি বুদ্ধিহীন ও বিবেকহীন হয়ে প্রযুক্তিমণ্ডলের দিকে খুব বেশি ঝুঁকে পড়ে তা হলে বিনাশের পথ থেকে ফিরে আসা সহজ না-ও হতে পারে। সংকট মুহূর্তে মানুষের মস্তিষ্কের সক্রিয়তা আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে যায়। তাই যদি ঘটে তা হলে ত্রাণমোচনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল, নয়ত ধ্বংস অনিবার্য। তবে অহেতুক আতঙ্কিত হওয়া যেমন অভিপ্রেত নয়, তেমনি নির্বিকার থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়।

(আগামী সংখ্যায়)

গ্রন্থসমালোচনা

"জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন"

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ মহাশয়ের প্রতিটি রচনা যেকোন মুক্তমনা জ্ঞানপিপাসুর কাছেই স্বাগত, সমালোচ্য তাঁর নবীনতম প্রবন্ধ সঙ্কলনটিও। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করে কেবল গড়পড়তা নয়, এমন কি প্রতিভাবান মানুষদের মনের গঠনের উপাদান উপস্থাপিত করি : "কোন মানুষেরই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-স্বভাব-চরিত্র-সংযম-সহিষ্ণুতা, বোধ-বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা নিখাদ নিখুঁত হতে পারেনা। শৈশবে-বাল্যে শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারে আচারিক ও আধিভৌতিক, অধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক কল্পনাজাত ধারণায় পুষ্ট এবং লাভ-ক্ষতি-চেতনা প্রসূত ভয়-ভক্তি-ভরসা বিজড়িত জীবনের প্রয়োজনে তুক-তাক, ঝাড়ফুঁক, বাণ-উচাটন, মন্ত্র-মাদুলি, তাবিজ-কবচ, তাগা-আঙটি যোগে অরিদেবতার রোষমুক্তি, এবং মিত্র-দেবতার করুণা-কৃপা প্রাপ্তি অপরিহার্য বলে দৃঢ় ধারণা জন্মে পারিবারিক-সামাজিক-শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপনে। তাই মানুষ নির্মোহ, বা প্রভাবমুক্ত চিন্তা-চেতনা নির্ভর জীবন যাপনে অসমর্থ। সাধারণ মানুষ ত এ আশৈশবের মগজ-ধোলাই মুক্ত হতেই পারে না, যুক্তিবাদী জ্ঞানী মনীষীরাও লঘু-গুরুভাবে এ প্রভাবের রেশ ও লেশমুক্ত থাকে না। তাই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ সমকালীন দেব-কাল-অঞ্চল-আবহাওয়া প্রভাবমুক্ত হতেই পারে না। স্বকাল-স্বদেশ-স্বসমাজ-স্বশাস্ত্র এবং আবাল্য অর্জিত বিশ্বাস-সংস্কারই তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।" (বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো কিছু কথা, পৃ ১০০)।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস ও সাহিত্যবিচারে শরীফ সাহেবের বক্তব্য চিরায়ত উক্তির পর্যায়ভুক্ত। সেই মানদণ্ডেই আমরা আহমদ শরীফ সাহেবের মানস-লোক-অভিযাত্রার অনুসন্ধান করার প্রয়াস পেয়েছি তাঁর সর্বাধুনিক (১৯৯২ খ্রী ফেব্রুয়ারিতে গ্রন্থাকারে গ্রথিত) পঁয়তাল্লিশটি প্রবন্ধের সঙ্কলন এই মাত্র ১১০ পৃষ্ঠার কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থটিতে।

প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য না হলেও গ্রন্থটির হ্রস্বায়তনের কারণ উল্লেখ করা দরকার। কারণ এতে সম্ভবতঃ তাঁর সর্বাধুনিক রচনাশৈলীর একটা বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। অধিকাংশ প্রবন্ধই নাতিদীর্ঘ—গড়ে দুই পৃষ্ঠার বেশি নয়। এত সংক্ষেপে এমন এক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা কম বাহাদুরির পরিচায়ক নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় গণিতের সূত্রের রূপে উপস্থাপিত বক্তব্য কোন কোন সময়ে পাঠকের কাছে দুরূহ মনে হতে পারে। তবে আহমদ শরীফ সাহেবের মানসিক বিচরণ চিন্তার যে উচ্চলোকে, তার সান্নিধ্য পেতে হলে কিছুটা পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন বলে বোদ্ধা পাঠক এই ক্লেশটুকু নিশ্চয় স্বীকার করবেন। কিন্তু এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রবন্ধগুলি লেখকের পূর্বতন বক্তব্য উপস্থাপনা ভঙ্গি থেকে কিছুটা পৃথক—যেন একটা আত্মগত, হয়ত বা আত্মসমাহিত ভাবের পরিচায়ক।

গৌরচন্দ্রিকার পর তাঁর বক্তব্য প্রসঙ্গে আসা যাক। গোড়াতেই ইঙ্গিত করা হয়েছে তিনি মুক্ত মনের চিন্তক। শুধু তাই নয় তিনি আধুনিকতা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন ও মননশীলতারও অধিকারী। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে! "দাঙ্গা বাধায় রাজনীতিকরা, সরকার, বেণেরা স্ব-স্ব প্রয়োজনে ও শ্রেণীস্বার্থে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু বা বিনাশ করতে। ওরা দাঙ্গায় অংশ নেয়না, মিথ্যা ঘটনা ও রটনার আশ্রয় নিয়ে উত্তেজনা ও প্ররোচনা দিয়ে স্বদলের, স্বধর্মের, স্ববর্ণের, স্বশ্রেণীর সম ও সহস্বার্থের লোকেদের প্ররোচনা-প্রবর্তনা দিয়ে, উৎকোচে, অর্থে, লুটের প্রলোভনে অজ্ঞ অনক্ষর দুস্থ শ্রমিক মজুরদের প্রলুব্ধ করে এগিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে উনজন সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করিয়ে, তাদের ঘরের জিনিসপত্র লুট করিয়ে পরে নিজেরা উনজনদের অর্থ সম্পদ, আড়ত, দোকান, কারখানা, বাড়িঘর দখল করে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায় ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এক বিশেষ চরিত্রের হিংস্র পশুপ্রায় মানব প্রজাতির, মনুষ্য অবয়বের কিছু প্রাণী, তাদের মধ্যে রয়েছে রাজনীতিক নেতা, বড় বেণে, কারখানাদার, আড়তদার প্রভৃতি।" (সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবাজি একার্থক ও একাত্মক নয়, পৃ ১০) বর্তমান সমালোচকের কাছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্বোক্ত কারণ বিশ্লেষণ অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয়েছে। কারণ ভারতের গত প্রায় তিন শ বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনিও একই সত্যে উপনীত হয়েছেন।

'ইতিহাসের বিকৃতিই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের উৎস' প্রবন্ধে তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান উক্তি করেছেন। এক

উপাস্তের কেবল ধর্মরাষ্ট্র হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে এক ধর্মমতের মানুষের নিবাস ও রাষ্ট্র থাকা এ যন্ত্রনির্ভর জীবনে ও জগতে সম্ভব নয়। পৃথিবীকে বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি অভিন্ন জীবনাচারে, জগৎ চেতনায় ও জীবন-ভাবনায় অভ্যস্ত করছে। ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এবং জাতীয় আঞ্চলিক সংস্কৃতি ক্রমে এবং অচিরে বিলুপ্ত হবেই। এর মধ্যেই পোষাকে, আসবাবে, তৈজসে অঙ্গে ও খাদ্যে এবং চিকিৎসা বিদ্যায়, যন্ত্রে, প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে অভিন্ন রূপে উঠেছে শহরে জনেরা।" (পৃ ১২)।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বপনের ব্যাপারে মিথ্যা ইতিহাস ও ইতিহাসের বিকৃত ভাষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে বিবেচ্য : "তুর্কী-মুঘলরা শাসন-শোষণ করতে এসেছিল, হিন্দুর ধর্মনাশ করে তাদের বিরূপ করে ছয়শ বছর রাজত্ব করা সম্ভব হত না তাদের পক্ষে। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে রাজকার্যে হিন্দু নিয়োগে আওরঙ্গজেব আকবরের চেয়েও উদার ছিলেন। তাঁর সময়ে শতে প্রায় তেত্রিশ ভাগ পদস্থ হিন্দু চাকুরে ছিল। বস্তুত হিন্দুর দেশে বিদেশী বিজাতি বিধর্মী স্বল্পসংখ্যক (ব্রিটিশের মতোই) তুর্কী-মুঘল হিন্দুর সাহায্য সহায়তা সহযোগীতা ব্যতীত দেশ শাসন করতেই পারত না। উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসিত রাজধানীতে এবং গাঁয়ে আজো মুসলিম সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। আর দীক্ষিত, দেশজ নিম্নবর্ণের বর্গের ও বিত্তের তুচ্ছ পেশা জীবিদের সঙ্গে তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর কোন সামাজিক-ধার্মিক-বৈবাহিক-সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক পরিচয়ই যে ছিল না, তার প্রমাণ গৌড়-মালদহ-রাজশাহী-দিনাজপুর-রঙপুরের দেশজ মুসলিমরা আজও ইসলামি নাম ও সংস্কৃতি রিক্ত।"

সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীভাবনার প্রতিকারের একটি পথ রামমোহন রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপথিক হবার সাধনা। এরই প্রতিফলন পাওয়া যায় শরীফ সাহেবের রচনায় যখন তিনি বলেন : "মানুষের লক্ষ্য ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলিম থাকা নয়, মানুষ হওয়া এবং কেবল ব্যক্তি মানুষ হিসেবেই পৃথিবীর যেকোন অঞ্চলে পরিচিত বা অভিহিত থাকা। এজন্য চীনে, ভারতে, পাকিস্তানে, রাশিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে, আমেরিকায় সর্বত্র ভৌগোলিক রাষ্ট্রিক বিন্যাস প্রয়োজন হবে, জরুরী হয়ে উঠবে সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য চেতনা বর্জন। বৈশ্বিক চেতনায় স্কন্ধ হতে হবে সবাইকে।" প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের মধ্যে রাজনৈতিক —আর্থিক সহযোগিতার প্রথম পদক্ষেপ হল সাংস্কৃতিক সহযোগিতা। সেই দিক থেকে শরীফ সাহেবের বিশ্বচেতনাও বিশ্বমানসিকতা তাবৎ প্রগতিশীল সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তির অনুকরণীয়।

"এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে বিশ্বমানবক্রমে আচারে-আচরণে মনে-মননে-মনীষায়-মনস্বিতায় এক সমাজভুক্ত হতে চলেছে। এমন দিন দূরে নয়, যখন পৃথিবীর সব মহাদেশের শিক্ষিত শহুরে মানুষ অশনে বসনে নিবাসে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে আচারে-আচরণে অভিন্ন হয়ে উঠবে। কাজেই সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য বলে কোন যৌক্তিক বৌদ্ধিক তত্ত্ব, তথ্য ও শ্রেয়স্কর কিছু থাকতে পারেনা।" (পৃ ২৭-২৮)

আহমদ শরীফ সাহেবের এই পর্যায়ের রচনাসমূহে তাঁর যুক্তি বাদী আধুনিক মন ও মনন-প্রক্রিয়ার শিখর-বিন্দু সম্ভবত: 'পশুহত্যায় ত্যাগ মহিমা', 'প্রকৃতজ্ঞান অতীতে নেই, আছে ভবিষ্যতের গর্ভে', 'বাঁচার জন্যেই স্বাধীন চিন্তা', 'নতুন মত ও পথ প্রয়োজন' ও 'সঙ্কট সমস্যা মোচনের জন্যে চাই নতুন মত ও পথ'। "এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আপাতত সরকার মাত্রেরই সেকুলার হওয়া।" পৃ ৩১) প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে। যেকালে ইসলামী মৌলবাদের আক্রমণে এক লেখকের বিরুদ্ধে ইরানে মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া তাঁর মাথার উপর তলোয়ারের মত ঝুলছে, মিশরে এক উদারপন্থী লেখক নিহত, আলজিরিয়াতে উদারপন্থা টলটলায়মান এবং পাকিস্তানে (কুমিল্লার গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাধ্যাত) সেবাভাব চালিত হয়ে স্বেচ্ছায় আই. সি. এস. পদ ত্যাগকারী পাকিস্তানের দরিদ্রদের অনন্য সেবক আবতার হামিদ খাঁ-এর উপর মৃত্যুদণ্ড উদ্যত খড়্গের মত বিরাজিত এবং আমাদের এই ভারতবর্ষে জমিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মশিরউল হাসান নাজনাবুদ ও পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরীর ডিরেক্টর দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আত্মরক্ষার লড়াই-এ রত, সেকালে বাংলাদেশের মত ইসলামকে সরকারী ধর্ম ঘোষণাকারী দেশে আধুনিকতা ও যুক্তিবাদচালিত হয়ে এজাতীয় মত ব্যক্ত করার জন্য নিঃসন্দেহেই বুকের পাটা চাই।

ভিন্ন প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে লেখকের ভাষার কথা সংক্ষেপে হলেও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাঙলা ভাষা গুরুতর বক্তব্য ব্যক্ত করার জন্য কত শক্তিশালী ও স্কন্ধ, কত ইঙ্গিতগর্ভ হতে পারে, শরীফ সাহেবের সব রচনার মত এই প্রবন্ধগুলিও তাঁর জলন্ত প্রমাণ। বাঙলা ভাষায় অনুপ্রাসের পাঠকমনে দাগ কাটার কী প্রবল ক্ষমতা তা শরীফসাহেব

নূতন করে প্রমাণ করেছেন। ভাষা ও শব্দ নিয়ে তিনি যেন স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করেছেন এবং এই ক্রীড়া পাঠকের কাছে তাঁর বক্তব্য-সমৃদ্ধ ভাবনা-চিন্তা সুচারুরূপে পৌছে দিয়েছে।

কিঞ্চিৎ অপ্রিয় মনে হলেও উপসংহারপর্বে একটি বিবেকরুতা পালন করতে হবে, যা শরীফসাহেবের মত পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্রবীণ লেখকের প্রতি অশ্রদ্ধাজনক বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। এটি হল—বিনম্রভাবে সত্যের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে মতভেদের কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা। চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা পরম শ্রদ্ধাভাজন লেখক এতে দোষ ধরবেন না—এই প্রার্থনা। তাঁর কয়েকটি বক্তব্যের প্রতিবাদ না করে থাকা যায় না। এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কোন রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করেই "কার্যত ভারত যদিও হিন্দুরাষ্ট্রই" মন্তব্য (পৃ ১২)। তাঁর উক্তি মৌলবাদী "বিশ্ব হিন্দু পরিষদের" ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং "হিন্দুরাষ্ট্রের" যে পরিভাষা ঐ সংগঠন অথবা এর আদি প্রবক্তা সাভারকর গোলওয়ালকর প্রমুখ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দিয়েছেন তা তাঁর জানার কথা। এর মুসলিম সংস্করণ ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং জেনারেল জিয়া ও এরসাদের আংশিক ইসলামী রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাও শরীফ সাহেবের আছে। এর কট্টর রূপের প্রবক্তা পাকিস্তানের মৌলানা মওদুদী ও বর্তমান বাংলাদেশের গোলাম আজমের বক্তব্যের কথাও তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তারপরও ভারত-রাষ্ট্রের চরিত্র সম্বন্ধে এজাতীয় উক্তি হলে তার প্রতিবাদ না করে থাকা যায় না। তিনি যদি বলতেন যে ইদানিং ভারতে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রবক্তারা বেশ শক্তিশালী হচ্ছে, অথবা মাঝে মাঝে সরকার ও তার নেতারা ধর্মনিরপেক্ষতের নীতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে মাথা অবনত করে সে অভিযোগ মেনে নেওয়া যেত। চট্টজলদি ও সুদূর প্রসারী বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমির বিবাদ থেকে শুরু করে আরও অনেক ক্ষেত্রে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতের এই পাঞ্জা লড়ালড়ি চলছে, যার কথা এদেশের বিবেচক মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান—সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকেরাই স্বীকার করবেন। আহমদ শরীফের মত যুক্তিবাদী পণ্ডিত ব্যক্তির চোখে প্রতিবেশী দেশের এই সংগ্রাম ধরা পড়েনি—এটা পরম দুর্ভাগ্য। এমনি একটি মার্কসবাদী 'অবসেসন' প্রসূত উক্তি "মৌলবাদের উন্মেষ, প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার চেলা রাষ্ট্রগুলো…" ইত্যাদি। নিজেদের দোষ-ত্রুটির জন্য বাইরের কাউকে দায়ী করার সহজ বৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রাম কালে ভাবতাম যে ইংরেজ চলে গেলেই এদেশে সুখের বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ কুত্রাপি তা ঘটেনি। আত্মদর্শন ও আত্মশক্তির অভাব না ঘটলে পরাধীনতা বা রাষ্ট্রীয় সংহতিনাশী মৌলবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রকট হয় না। ইংরেজ বা মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মত বহির্শক্তি কেবল তার সুযোগ নিতে পারে। মূল ব্যাধি নিজেদের ভিতরে। অপ্রিয় ও দুরূহ প্রসঙ্গ হলেও সমস্যার মূলে যাবার চেষ্টা করা দরকার।

দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে তাঁর একটি সঙ্গত খেদোক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। ঢাকার 'বিচিত্রা' পত্রিকায় গত বছর কলকাতার বার জন প্রথ্যাত সাহিত্যিকের স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়েছিল যে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নেই। কারণ দুদেশের মধ্যে সাহিত্যিক আদানপ্রদানের নানা বাস্তব বাধা। এদিকের অন্নদাশঙ্কর, শিবনারায়ণ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা রয়েছেন। ওদিক থেকে স্বয়ং আহমদ শরীফ সাহেব ও তাঁর মতাদ্বর্তীরা মিলিতভাবে একটা আন্দোলন খাড়া করতে পারেন না? বার্লিনের এত দিনের স্থূল দেওয়াল অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার থেকে অর্বাচীন দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পৃথককারী এই অদৃশ্য দেওয়াল ভাঙা যায় না?

জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন—আহমদ শরীফ/ বস্তু প্রকাশন ৬৮/২ পুরানা পল্টন ঢাকা / বাংলাদেশ মূল্যর ৪০ টাকা।

সোনার বাংলার স্বপ্ন

সনাতন মিত্র

"এরা আধা-মুসলিম"—জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৫২ সালে এই মন্তব্য কেন করেছিলেন আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তার আগে ১৯৫১ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ "জাতীয় ভাষা দিবস পালন করেছিল, দাবি করেছিল বাংলা হোক জাতীয় ভাষা। তারও আগে ১৯৪৮-এর ২১শে মার্চ, পাকিস্তানের কায়েদ-এ-আজম

মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ যে দিন ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন যে উর্দু, শুধু উর্দুই পাকিস্তানের ভাষা হবে, সেখানকার ছাত্র সমাজ তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল, বাংলাকেও সে মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৫২-তে আন্দোলন এমন প্রবল হয়ে উঠল, শুধুমাত্র ভাষার দাবিতেই তা আর আবদ্ধ থাকবে না স্পষ্ট বোঝা গেল। ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্রদের মিছিলের ওপর গুলি চলল, রক্তাক্ত হল ঢাকার রাজপথ। বোঝা গেল, এ শুধু বাংলা-ভাষার মর্যাদার প্রশ্ন নয়, বাঙালি হয়ে বাঙালি জাতির সসম্মানে বেঁচে থাকার প্রশ্ন। মুসলিম হলেও সে বাঙালি, তার বাঙালি মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকার দাবি নিয়ে প্রশ্ন।

এ দাবি যে করে সে কি পুরো মুসলিম? দেখা গেল ভুট্টো তা বিশ্বাস করতে রাজি নন। ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকলে, সেই আধা মুসলিমদেরকে পুরো-ইসলামী পাকিস্তানী প্রজাতন্ত্রের অনুগত প্রজা করে রাখবার জন্যে তিনি কী উপায় অবলম্বন করতেন কে জানে, কিন্তু সে রকম কোন চেষ্টাই যে শেষ পর্যন্ত সফল হত না, যা অসম্ভব তা যে শেষ পর্যন্ত অসাধিতই থেকে যেত, আজ পিছনের দিকে তাকিয়ে তা আমরা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি। অসম্ভবের সাধনা রাজনীতিকের কাজ নয়। তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে নানারকম অলীক স্বপ্ন মানুষকে দেখিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু নিজেরাও যদি তাঁরা মায়া-মরীচিকার পিছনে ধাবমান হন, কিংবা মোহাবিষ্ট মানুষকে এগিয়ে দেন নিরর্থক রক্তক্ষরণের পথে, যা হবার নয় তার দিকে, তা হলে পরিণতি যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে ইতিহাস বারে বারে সে বিষয়ে আমাদের সাবধান করে দিয়েছে। একই শিক্ষা অধিক থেকে অধিকতর মূল্য দিয়ে আর মানুষকে কতবার গ্রহণ করতে হবে?

বাঙলাদেশের জন্মের ইতিহাস আরেকবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, যে-মাটিতে মানুষ গড়া তাকে নস্যাৎ করতে নেই। করলে কী হয় তার একজন প্রধান সাক্ষী বাংলাদেশের এক অগ্রগণ্য সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন। ৬৮-৬৯-৭০-৭১-এর সেই অবিনশ্বর দিনগুলোতে তথাকথিত পূর্ব-পাকিস্তানীরা যখন দেখল তাদের আত্মপরিচয়টাকেই তিন তুড়িতে উড়িয়ে দেবে মনে করেছে এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে তরবারি নিয়ে একদল বিদেশী, তখন মানুষের সেই চূড়ান্ত অপমান কী আগুন জেলে দিল মানুষের মনে, কেমন করে আগুনের বেড়াজাল ঘিরে ধরল সেই মূঢ় ক্ষমতা মদমত্ততাকে, সত্যিকারের মানুষের সামনে পড়ে কুঁকড়ে গেল অলীক মানুষ, যার ধমনীতে রক্ত বয়না, তত্ত্ব-কথার বান ডাকে, 'আত্মস্মৃতি'-র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত দিনলিপিতে শামসুদ্দীন তার দৈনন্দিন বিবরণ ধরে রেখেছেন। ঘটনা কিছু কিছু তাঁর নিজের চোখে দেখা, বাকি নিজের কানে শোনা। ইতিহাস লিখতে এই ধরনের সমসাময়িক বিবরণ খুবই কাজে লাগে, যাকে বলে 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।' অবশ্য এত ঠিক রিং-এর ধারে বসে বক্সিং দেখা নয়, এক্ষেত্রে অনেক কিছুই অচেনা থেকে যায়, কিংবা বলা উচিত, যা ঘটছে তার অতি সামান্য অংশই কোন একজন ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পায়। বাকি সব, রাজাদের মত, কান দিয়ে দেখতে হয়। আবু জাফর শামসুদ্দীনের পেশাগত শিক্ষা পর্যবেক্ষণে, তথ্য সংগ্রহে এবং স্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কার করে তাঁর গোচরীভূত বিষয় লিখে রাখায় সাহায্য করেছে। চরম বিপদের মধ্যেও তার যথাযথ বিবরণ ঠাণ্ডা মাথায় লিখে রাখতে পারা বড় সহজ কথা নয়। শামসুদ্দীনের ডায়েরিতে সে রকম বিবরণ পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। এতে তিনি ঋণে আবদ্ধ করেছেন শুধু পাঠককে নয়, ভবিষ্যতের ইতিহাস রচয়িতাকেও।

"২৫.৩.৭১ বৃহস্পতিবার। রাত বোধকরি তখন ১২টা বেজে কিঞ্চিৎ বেশি, মালিবাগের দিকে প্রথম গোলাবর্ষণের শব্দ শুনলাম। একটু পরেই ট্যাঙ্ক মেশিনগান, স্টেনগান প্রভৃতিসহ সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করলো। পুলিশবাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক বোধকরি সাবধানবাণী শোনায় বন্দুকসহ সরে পড়েছিল—বাকী লোকরা সারারাত আত্মরক্ষা করলো।

লাইন থেকে দেড় দু'শ গজের মধ্যে বাড়ী—পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল, ওপরে টিনের চাল, রাত কাটালাম মেঝেয় শুয়ে। ট্যাঙ্ক, মেসিনগান, এ্যাকব্যাক, স্টেনগান, তোপ, Salvos after salvos অবিরত চলছে। একটি নরক রাত কাটালাম। রাত দু'টোর দিকে স্ত্রী ও কন্যাদেরকে পিছনের বাড়ীতে পাকা দালানে সরালাম।

আমি, খোকা (বড় পুত্র) এবং পারভিজ (সেজপুত্র) কর্ণ-বিদারী কামান বন্দুকের ধ্বনির মধ্যে Peering sound of bullets and salvos from tanks বাড়ীতেই কাটালাম।

জীবনে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হয়নি। এই প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম।"

ডায়েরি-লেখক যা দেখেছেন তাই লিখেছেন, বৃহত্তর রণক্ষেত্রের ঘটনাবলী (সে-সব এখন ইতিহাস) ক্রমে ক্রমে

তাঁর গোচর আসতে থাকে। আবার তেমন তেমন খবর হলে মুখে মুখেও তার ছড়িয়ে পড়তে দেরি লাগেনি। ২৪ মার্চ তারিখই তিনি ডায়েরিতে লিখছেন: "চট্টগ্রাম বন্দরে গোলাবারুদ প্রভৃতি সাময়িক সরঞ্জাম বোঝাই এম. ভি. সোয়াত জাহাজ নোঙ্গর করলে জেটির লোকেরা মাল খালাস করতে অস্বীকার করে। তখন ৫০০ লোকের এক সেনা-বাহিনী ২৫টি ট্রাক নিয়ে ১৭ নং জেটিতে মাল খালাস করতে গেলে প্রায় ৫০০০০ হাজারের এক জনতা তাদের ঘিরে ফেলে এবং বাধা দেয়। জনতা আগ্রাবাদ হতে নতুন পাড়া ক্যান্টন-মেন্ট পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। অন্ধকার রাতে অন্ততঃ ৪০ রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয়। হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা সম্ভব হয়নি। হাজার হাজার সাম্পানও জাহাজটাকে ঘিরে রেখেছে।"

নানা জায়গা থেকে সশস্ত্র সংঘর্ষের খবর আসছে, অসহযোগ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র, আওয়ামী লীগ নাকি ঘোষণা করেছে, ২৫.৩.৭১-এর মধ্যে "ঘোষণা না এলে বাংলাদেশ তার নিজের পথ বেছে নেবে।" নিজের পথ মানে স্বাধীনতা, মুজিব বলেছেন, "স্বাধীনতা আমাদের শেষ স্টেশন।"

আসলে ঘটনা স্রোত তখন দুর্বার গতিতে সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে, মুজিবেরও সাধ্য নেই তার পথ রোধ করার। শামসুদ্দীন স্পষ্ট বুঝে গেছেন, "বাঙালী আসলে একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি।" (২৪.৩.৭১)

মারাত্মক ভুল করেছিলেন তাঁরা, যাঁরা ভেবেছিলেন ধর্মের নাম করে বাঙালিকে বাংলা ভাষা ভুলিয়ে দেবেন, ভেবেছিলেন, বাংলা ভাষার ওপর হিন্দুত্বের কলঙ্ক লেপন করে পূর্ব পাকিস্তানীকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গর্ব অনুভব করতে শেখাবেন। 'পাকিস্তান অব-জার্ভার' পত্রিকায় মুদ্রিত একখানি চিঠিতে এই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শামসুদ্দীন সেই চিঠির খানিকটা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন:

The Bengali language today—and inspite of twenty years of Pakistan—continues to be a vehicle for the expression largely of Hindu thought forms and Sanskrit civilization and is drenched with Hindu philosophy and outlook on life more than any other language of India. লেখকের মন্তব্য: "পত্র লেখকের মতে বাঙালী মুসলমান, মুসলমান নয়।"

এই রকম একটা মনোভাবের বশবর্তী হয়ে "অবাঙালী মুসলমানেরা পূর্ব পাকিস্তানে যে কাণ্ড করল তার পরিণতিতে তারা মুসলমান তো দূরে যাক, আদৌ মনুষ্যপদবাচ্য কিনা সেইটাই সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়াল সেখানকার অধিবাসীদের মনে।" ২২. ৪. ৭১ তারিখে ডায়েরিতে লেখা দেখছি, "হিটলারীয় বর্বরতার ও পৈশাচিকতাকে হার মানিয়েছে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী। মাসিক ১৮ টাকা বেতনের বিনিময়ে এরা ইংরেজের পক্ষে ভারতবাসীর বুকে গুলি চালিয়েছে, রঞ্জিত সিংহের হয়ে স্বদেশবাসী মুসলমান হত্যা করেছে·· পাঞ্জাবী মুসলমানরূপে পরিচিত এই নরপশুগণ জারজজাতি। গ্রীক, শক, হুন, মগোল প্রভৃতি বহু আক্রমণকারীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট এই জাত ভারতের কলঙ্ক।"

এ বড় ভয়ংকর অবস্থা। জাতিবিদ্বেষ কী মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যাতে মানুষ মানুষের দিকে এমন বিষ-দৃষ্টিতে তাকাতে পারল, সামূহিক হিংসা এবং প্রতিহিংসা কোথায় পৌঁছেছিল, যাতে আবু জাফর শামসুদ্দীনের মত একজন শিক্ষিত, উদারচেতা মানুষ, একজন চিন্তাশীল লেখক একটা গোটা জাতির ওপর এমন ধিক্কার বর্ষণ করতে পার-লেন, ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়ান মূঢ়, অন্ধ, হিংসা ও প্রবল অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধের কাহিনী। তার পিছনে দেখা যাচ্ছে নানারকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, এক পা এগোন ত তিন পা পিছোন, ভরাডুবির মুখে দাঁড়িয়ে পাই পয়সা নিয়ে দরকষাকষি। ইয়াহিয়া খান এক নিশিতে পাওয়া স্বপ্নচারী, জুলফিকার আলি ভুট্টো ক্ষমতার শিখরে চড়বার চেষ্টা করছেন, জানেন না "হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা, যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রধনুচ্ছটা।" এদিকে ভাসানীকে নিয়ে তাঁরা কী যে করবেন বুঝতে পারছেন না যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। শামসুদ্দীন লিখেছেন: "বৃদ্ধ বয়সে মওলানা ভাসানী কি পাগল হয়ে গেলেন? তিনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, কৃষাণ মানুষের রাজত্ব কায়েম করবার সময় এসেছে·· মওলানা ভাসানীর কি এখন একটু সংযত হওয়া ভাল নয়? নাকি তিনি ভাবছেন, মার্শাল ল আসে আসুক—যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে তার দ্বারাই এস-পার ওসপার হয়ে যাক সমস্ত সমস্যা। কিন্তু পরাজয় যে গণমুক্তি আরো বিশ তিরিশ বছর পিছিয়ে দিতে পারে।"

পাগল হননি, আসলে মওলানার একটা স্বপ্ন ছিল, ইসলামিক সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। তাই একহাতে পাকিস্তানী

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, আরেকহাতে হিন্দুপ্রধান প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে তাঁর লড়াই। তার ওপরে আবার পিছনে আছে আরেক পয়লা নম্বর দুশমন। শামসুদ্দীন ১৭. ৯. ৭০ তারিখে তাঁর ডায়েরি লিখছেন, "মওলানা ভাসানী গতকাল রাওয়ালপিণ্ডি নিস্তার পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার পয়লা নম্বর দুশমন। ইসরাইলকে আরবদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমর্থন এবং ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধকালে ভারতকে সমর্থন—এগুলোকে তিনি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেন।"

১. ৪. ৭১ তারিখে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে যাবার পথে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ওপরে গড়ে উঠেছিল শামসুদ্দীনেরও এক অপরূপ স্বপ্ন, গোটা ব্যাপারটা তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না:

"আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো গেঁয়ো পথের ধারের বাড়ীঘর ও তার মানুষ। পথি-পার্শ্বে স্থানে স্থানে গুড়মুড়ি চিড়া—মাটির কলসী ভর্তি পানি প্রভৃতি উপাদেয় আহার্য নিয়ে বসে আছে পাকিস্তানী আক্রমণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠা পল্লীর স্বেচ্ছাসেবকগণ। যুবক, বুড়ো, বালক, বালিকা সব রকম এবং অবস্থায় লোক আছে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে। পলায়নপর প্রতিটি কাফেলার সঙ্গে জিনিসপত্র, টাকাকড়ি, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি কমবেশী আছে। কিন্তু কোন লোভীর লোলুপ দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ নেই। সুস্বাস্থ্যবতী যুবতী নারীর ওপরও পল্লীযুবকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। এক জায়গায় আমার কাফেলাটিকে সমাদর করলেন একদল স্বেচ্ছাসেবী, ওঁরা বললেন, বসেন পানপানি খাইয়া জিরাইয়া লইন। আমরা বসে তাদের সমাদর রক্ষা করলাম। মুড়িগুড় পানি খেয়ে ক্লান্তি নিবারণের পর আমরা ওদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। পথ চলতে চলতে আমার মনে হলো, বাংলাদেশ বুঝিবা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের প্রভাবে সহসা সর্বপ্রকার অপরাধমুক্ত দেশে রূপান্তরিত হলো। মুক্ত হলো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি হতেও। কেননা নিরাপত্তার সন্ধানে পলায়নপর কাফেলা এবং পথিপার্শ্বের স্বেচ্ছাসেবকদের মন ও মানসে ধর্ম, সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য ও পার্থক্য বোধের প্রমাণ দেখিনি। মনে হলো, যুদ্ধে বিজয়লাভের পর—জয় তো হবেই—আমরা দেখবো ভস্মাবশেষ হতে উদ্ভূত এক নতুন বাংলাদেশ।"

১৯৮৮ সালে আবু জাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যু হয়। আজ বেঁচে থাকলে তিনি কী দেখতেন? ২২ ফেব্রুয়ারিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর:

"ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি—একুশের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন আজ বাংলাদেশের আপামর মানুষ। বরাবরের মতো এবারেও ছিল সেই একই দৃশ্য। কাকভোরে ঘুম থেকে উঠেই কাতারে কাতারে মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন একুশের শহিদ মিনারের তলায়। কারও হাতে ফুল, কারও হাতে ফুলের তোড়া। একচল্লিশ বছর আগে বাংলা ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন সকলে। কিন্তু শহিদ মিনারের করুণ দশা দেখে সকলেই হতাশ, মর্মাহত। গতকাল জনা পঁচিশেক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক রং দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে মিনারের অঙ্গসজ্জা, আলপনা। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ঠিক উল্টোদিকের দেওয়াল রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুকান্ত এবং নজরুলের উদ্ধৃতির উপরও দুষ্কৃতীরা রং কালি বুলিয়ে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। শহীদ মিনারে যখন এই তাণ্ডব চলছে, তখন সেখানে উপস্থিত অন্ততঃ তিনশো মানুষ এবং পুলিশের একটি বাহিনী। কিন্তু দুষ্কৃতীরা তাদের চোখের সামনেই যাবতীয় কাজ সেরে পালিয়ে যায়।"

হায়, সে স্বপ্ন এখনও স্বপ্ন।

আত্মস্মৃতি: দ্বিতীয় খণ্ড: সংগ্রাম ও জয়—আবু জাফর শামসুদ্দীন / পরিবেশক: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা / বাংলাদেশ মুদ্রায় ১২৫ টাকা।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এবং অকতাভিও পাথ-এর কবিতা

কমলেশ সেন

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ জীবনকে অতিক্রম করে কবিতার এক বিস্ময়কর জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

এক বৈচিত্র্যময় সংগ্রামমুখর জীবন তাঁর। দেশবিভাগের পর এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি নিশ্চিন্তে বসে থাকেননি। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বন্দী হয়েছেন, জেলে বসে কবিতা লিখেছেন। জীবনের নানা

দিক—সংগ্রামকে উল্টেপাল্টে দেখেছেন। জীবনের গভীর বোধ থেকে তুলে এনেছেন শব্দের বিস্ময়। এক একটি শব্দ দিয়ে গেঁথে তুলেছেন সংগ্রাম এবং স্বপ্নের রূঢ় বাস্তব।

স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনের মধ্যে মানুষের মুক্তি নেই। আর ধর্ম যখন রাজনীতিকে পরিচালনা করে—মানুষের রক্তের ওপর যখন ধর্মের রহস্যময় সৌধ নির্মিত হয়, তখন একজন যথার্থ মানুষ কোন্ ভাষায় কথা বলবে? কীভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠবে?

ফয়েজের কবিতা পড়তে পড়তে এক আধা-ঔপনিবেশিক এক আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মানুষ হিসাবে বারবার মনে হয়েছে লক্ষ কোটি ক্ষুধার্ত কৃষক জনতার কথা। যারা একমুঠো ভাত আর একখণ্ড পেঁয়াজ পেলেই সন্তুষ্ট। ছেঁড়া জামা আর লুঙ্গি সম্বল করে যারা বছরের শীতটা কাটিয়ে দিতে পারে অনায়াসে।

এরকম একটা দেশের দরিদ্রতম মানুষের কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। আর তাঁর দেশ—ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর চোখে যিনি ইসলাম বিরোধী—কাফের। তাঁর অপরাধ 'আল্লার দেশে' তিনি কোন গরীবী রাখতে চাননি। মানুষকে দরিদ্রতার উৎসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলেছেন।

আর একথা তিনি নানাভাবে নানা উপমায় উপস্থিত করেছেন। ভাষার অভিপ্রায়কে ঢেলে সাজিয়েছেন। সুললিত শব্দের মধ্যে এনেছেন ক্রোধ ঘৃণা মহত্ত্ব এবং প্রেম। ব্যক্তি প্রেম সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এনেছেন মানুষের চির বিশ্বাস এবং স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন তাঁর কাব্যের জগতে নতুন প্রত্যয় এনে দিয়েছে। উর্দু কবিতার যে চিরায়ত ধারা, সেই ধারায় তিনি এনে দিয়েছেন বিপ্লব। এই বিপ্লব শব্দ প্রয়োগে প্রতীকে, ব্যঞ্জনায়, অনুভবে, অভিব্যক্তিতে।

এক দুঃসহ বেদনাবোধও তাঁর কবিতার জগৎকে গূঢ় রহস্য থেকে মুক্ত করেছে। আর এই মুক্তি সম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর সমকালের মানুষের ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্যে। অত্যাচার এবং নির্যাতন থেকে উঠে এসেছে যে মানুষ, সে কোন্ ভাষায় কথা বলবে? তার নীরবতা—স্তব্ধতাও ত কোন কিছু উচ্চারণ করে। নিস্তব্ধ চোখের চাহনি কী জানায়? মানুষের অন্তরের যে যথার্থ প্রেম, তা তখনই চিরায়ত হয়ে ওঠে, যখন ব্যক্তি মানুষের সমগ্র মানুষের মধ্যে মুক্তি ঘটে। এই মুক্তির অন্তর কথাই তিনি বারবার উচ্চারিত করেছেন।

'নক্‌শ-এ-ফরিয়াদী', 'দস্ত-এ-সবা' থেকে শুরু করে 'মেরে দিল মেরে মুসাফির' পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে তিনি কখনও স্থির প্রত্যয়ে কখনও উচ্ছ্বাসে, কখনও ক্ষোভে, কখনও দুঃখে-বেদনায়, কখনও স্থিতধী হয়ে বিশ্বমানবাত্মার কথা বলেছেন। এই বিশ্বমানবাত্মা দেশে দেশে একই আশায় বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতার সঙ্গে আমাদের বাঙালি পাঠক সেই পঞ্চাশ দশক থেকেই কিছুটা পরিচিত। বাংলাদেশে শ্রদ্ধেয় রণেশ দাশগুপ্ত মূল উর্দু থেকে অনেক আগেই কিছু অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আফ্রো-এশিয়া লেখক সংঘ, বাঙলাদেশ শাখা 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা' অনূদিত করে প্রকাশ করেছে। যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠিত কবি। অনেকেই উর্দু জানেন। এই পশ্চিম বাঙলা থেকেও কয়েক বছর আগে 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা / প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়েছে। সে গ্রন্থও মূল উর্দু থেকে অনূদিত।

সম্প্রতি—১৯৯২, ফেব্রুয়ারিতে নীলাঞ্জন হাজরা 'উতলা হোসনে প্রাণ, ধীরে'—এই নামে ফয়েজের কিছু কবিতা অনুবাদ করেছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'কাব্যিক বিচারে নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত ছিল তাঁর কবিতার মূল। গালিব এবং ইকবালের সঙ্গে সরাসরি ছিল তাঁর কবিতার যোগসূত্র, তবু এক আশ্চর্য মমতায় পুরনোকে মন্থন করে তিনি কবিতায় আনতেন নতুন সুর।'

বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন 'শিল্পের জন্যে শিল্প'—এই তত্ত্বের বিরোধী। তার কাব্যগ্রন্থ 'দস্ত-এ-সবা'-র ভূমিকায় কবিতা সম্পর্কে তিনি যে মত প্রকাশ করেন তা আমরা স্মরণ করতে পারি। তাঁর কবিতায় উর্দুর চিরায়ত প্রতিক্ষা মদিরা এবং সাকী তাই অন্য রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। রক্তাক্ত দেশ দুঃখ-যন্ত্রণার ভারে ব্যথাতুর প্রিয়তমা হয়ে উঠেছে। শব্দকে তিনি এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা চিরায়ত উপমা না হয়ে, বর্তমানের অভীপ্সা হয়ে জাগরূক হয়ে উঠেছে। শব্দের নির্বাচনে রক্তাক্ত হৃদয় উন্মোচন করে দিয়েছেন।

একটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক, বিশেষ করে উর্দু কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে, তা হচ্ছে, উর্দুতে এমন অনেক শব্দ আছে, যা উপলব্ধির জগতে পৌঁছলেও অন্য ভাষায় রূপান্তরের সময় সতর্ক থাকতে হয়। এই সতর্কতার অভাব

ঘটলে কবির সঙ্গে অনুবাদকের বিচ্ছিন্নতা ঘটবেই। এ ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এমন অনেক শব্দ আছে, যা অনুভবে পৌঁছে দিতে গেলে বাংলার একাধিক শব্দের সহযোগিতা নিতে হয়। এ খামতি ত একদিনে বা অল্পদিনে যাবার নয়।. আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে যেভাবে সম্পৃক্ত, তেননিভাবে আমাদের দেশের অন্যান্য ভাষার বা প্রতিবাদি দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নই।

এ কাব্যগ্রন্থে মোট তিরিশটি কবিতা আছে। আর আছে বাইশটি শের। অনুবাদক চেষ্টা করেছেন সহজভাবে অনুবাদ করে বাঙালি পাঠকের কাছে ফয়েজকে পৌঁছে দিতে।

'নাজিক হিকমত'—নামে যে কবিতাটি অনূদিত হয়েছে, তা ফয়েজের কবিতা নয়। ফয়েজ নাজিম হিকমতের কিছু কবিতা একসময় অনুবাদ করেছিলেন। যে কবিতাগুলো তাঁর কাব্যগ্রন্থে অনুবাদ হিসেবে সংকলিত আছে। অনুবাদক হয়ত ভুল বশতঃ এ কবিতাটিকে ফয়েজের কবিতা ভেবেছেন।

সম্প্রতি হিন্দি পাঠকদের জন্যে হিন্দি প্রকাশকরা দেবনাগরী লিপিতে উর্দু কবিদের কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশ করছেন। প্রতিটি উর্দু শব্দের ফুটনোটে আক্ষরিক অর্থ দিয়ে দিচ্ছেন। এই আক্ষরিক শব্দগুলোকে ধরে নিলে অনুবাদে ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক্। শব্দের নির্যাসে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তাছাড়া মাত্রারও একটা ব্যাপার আছে। উর্দু উচ্চারণ এবং লেখনের মধ্যে যে ফারাক থাকে তারও বিভ্রান্তি ঘটে। হিন্দিতে অতখানি না ঘটলেও, বাংলাতে ঘটা খুবই স্বাভাবিক! আর তা এক্ষেত্রেও ঘটেছে।

ফয়েজ এমন মাপের কবি, আর এমনভাবে ভাষাকে প্রক্ষেপ করেছেন, এমন ব্যঞ্জনা এবং অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন, যা মাঝে মাঝে অনুবাদ করা সত্যিই দুঃসাধ্য। এ-দুঃসাধ্য কাজে আজ অনেকেই ব্রতী হয়েছেন।

লাতিন আমেরিকার স্পানিস সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি-পাঠক সমাজের পরিচয় খুব গভীর এবং বেশি দিনের না হলেও, নেহাৎ কম দিনের নয়। গত তিন দশক ধরে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য সম্পর্ক আমাদের আগ্রহ বেড়েছে। আর এই আগ্রহ বেড়েছে শুধু লাতিন আমেরিকার কবিদের এবং কথাশিল্পীদের নোবেল প্রাপ্তির জন্যে নয়, বরং আগ্রহ আরও বেড়েছে সেখানকার রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে যে নতুন সাহিত্য জন্ম নিচ্ছে, তার জন্যে। স্পেনের লোরকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকেই। আর লাতিন আমেরিকার চিলির কবি পাবলো নেরুদার সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রায় ঐ একই সময়ে। নেরুদারও ভাষা স্পানিস। সত্তর দশকে এবং তার পরবর্তী দশকগুলিতে একাধিক কবি নেরুদার কবিতা অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। লোরকা এবং নেরুদার কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অকতাভিও পাথের দীর্ঘ অনুরণনধর্মী এবং বিপুল প্রতীক আশ্রয়ী 'আদিত্য শিলা'র অনুবাদক অতনু রেজ এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'লোরকার কবিতার মধ্যে প্রাচ্য দেশীয়, মূলত আরবি প্রভাব আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। গজল ও কসিদার রূপ আন্দালুসীয় উপভাষার উপাদানে লোরকার কাব্য জগত কেমন করে গড়ে উঠেছে তা বাঙালী-কাব্য মোদী সমাজ তেমনভাবে দৃকপাত করেনি, যেন লোরকার জীবন ছাড়া আর কিছুই বিচার্য ছিল না। অন্যদিকে নেরুদার কবিতারও বিচার সম্যকভাবে ঘটে ওঠেনি। চিলির নিসর্গের আদিম রূপ সারা কাউনীয় লোকসংস্কৃতির প্রভাবে পরিশীলিত হিস্পানী ভাষায় কেমন অদ্ভুত কাব্য শরীর পরিগ্রহ করেছে নেরুদার কাব্যে তা প্রায় অনালোচিত।' কবি-অনুবাদক অতনু রেজের এই আক্ষেপ হয়ত আংশিক সত্য।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা অন্তত বলা যায়, লাতিন আমেরিকায় যে-হিস্পানী ভাষা এবং সাহিত্য দীর্ঘ—দীর্ঘ দিন ধরে লালিত-পালিত হয়ে ওঠে, তা ছিল বিজয়ী আক্রমণকারীর ভাষা—বিজয়ীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি। অস্ত্রবলে লাতিন আমেরিকার বিশাল অঞ্চল জয় করলেও, এখানকার জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যায়নি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করে শিক্ষা সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে স্পেনের আক্রমণকারীরা বিজয়ীরা ভেবেছিল, তাদের মানস জগৎকে একবারে পালটে দিতে পারবে। কিন্তু তাদের রক্তের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে তাদের পরম্পরাগত পরম বিশ্বাস লোকধর্মের অভীপ্সা, লোককাহিনী লোকগাথা এবং নানা ধরনের কিংবদন্তী—আর যার মধ্যে আছে গভীর রহস্যময়তা।

জন্মসূত্রে নেরুদার মতো পাথ-ও এই বিপুল ঐশ্বর্য এবং ঐতিহ্য নিয়ে কাব্য জগতে যাত্রা করেন। আজতেক, মায়া, তোলতেক এবং ওমতেক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ, পুরাণ, তন্ত্র মেহিকোর সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো। আর তার সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ তার গহন অরণ্য, তার উষর মালভূমি, তার রুদ্র সমুদ্র এবং উত্তুঙ্গ পাহাড়-শিখর। প্রকৃতির

এই বৈচিত্র্যের সমাহার লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মত মেহিকোর সাহিত্যেও প্রাণ-প্রাচুর্য আনে। এক ইন্দ্রজাল এক রহস্যময়তা তার কবিতার শরীরে অন্তর্লীন হয়ে থাকে।

তাই অনেক সময়েই এই পুরাণ লোককাহিনী এবং তন্ত্রের রহস্যময়তা আমাদের বিহ্বল করে—আমাদের বাধা সৃষ্টি করে লাতিন আমেরিকার কবিতার গভীরে প্রবেশ করতে। যে-প্রতীক অনায়াসভাবে ব্যবহৃত হয়, যে-নিসর্গ মানুষের মত জীবন্ত হয়ে ওঠে, তা অনেক সময়েই আমাদের স্পর্শাতুর করে তোলে। আমরা বিহ্বল হয়ে পড়ি। খুঁজতে চেষ্টা করি লোকায়ত ধারাকে—লোকায়ত প্রতিভাকে।

কবি পাথ-এর জন্ম ১৯১৪ সালে মেহিকো শহরে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত ১৯৪১-এ, নাম 'শব্দের ভেতর মুক্তি'। ১৯৫২-এ 'বাজপাখি বা সূর্য' ১৯৫৪-এ 'মন্ত্রে বীজরোপণ', ১৯৫৭-এ 'আদিত্য শিলা' এবং ১৯৫৮-এ 'হিংস্র বাসভূমি' প্রকাশিত হয়। 'আদিত্য শিলা (Piedra De Sol) তাঁর এক দীর্ঘ কবিতা—যেন স্তবগাথা। সমগ্র মেহিকোর লোকসত্তা এবং দুরন্ত প্রকৃতি এক মানবিক অভিপ্রায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কবিতা সম্পর্কে পাথ-এর একটি নিজস্ব ধারণা আছে। তিনি তাই বলেন, 'ইতিহাসকে সরিয়ে রেখে কবিতা সম্ভব নয়। আবার ইতিহাসের রূপান্তর ব্যতীতও কবিতার কোনো লক্ষ্য—কোনো অভিপ্রায় নেই। সুতরাং সত্যিকারের বিপ্লবী কবিতা হল প্রকাশের,—উন্মোচনের কবিতা।···ইতিহাস এবং সমাজের অপরিহার্য—সেই ভাষা দিয়েই কবিতার নির্মাণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতার বচন যুক্তিপূর্ণ আলোচনার গণ্ডির বাইরে অন্যান্য যে নিয়মগুলো রয়েছে, তা দিয়ে ভাষাকে আবার নির্মাণ করে নেয়।'

পাথ-এর কবিতায় ভাষার এই নব নির্মাণ আমরা লক্ষ করি। বুঝতে পারি একটি শব্দের অস্তিত্ব অন্যান্য শব্দ ব্যতিরেকে অসম্ভব। অন্য ভাবে বলা যায়, অন্যান্য শব্দবন্ধ ছাড়া বিচ্ছিন্ন একটি শব্দবন্ধের কোনও তাৎপর্য নেই।

কবি পাথ-এর মানসিক জগৎ গড়ার পেছনে সমসময়ের যে অবদান আছে তা কে অস্বীকার করবে? কবি নিজেও করেননি। কবি শুধুমাত্র মেহিকোর অধিবাসী নন, কর্মসূত্রে বিশ্ব নাগরিকও বটে। সেজন্যে তাঁর কবিতায় একটা আন্তর্জাতিক মনোভাব লক্ষ করা যায়। কবি মানসের প্রস্তুতি পর্বে প্যারিস এবং মাদ্রিদে বসবাস তাঁকে ইউরোপীয় কবিতার একটা যুগ সন্ধিক্ষণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্যারিসে তিনি স্যুররিয়ালিজমের আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন এবং মাদ্রিদে ফ্রাংকো-বিরোধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাহিনীতে যোগ দেন। এবং কমিউনিস্টদের খুব কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। এ-দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁর জীবনের যে-গতিপথ, সেই গতিপথে তাঁকে স্বপ্নের গভীর অর্থময়তার মধ্যে নিয়ে গিয়েছে, আর সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তাঁকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কঠোর সমালোচক করে তোলে।

আর তাঁর কাব্যের দেহে এই প্রতিবাদ এক প্রচণ্ড নৈসর্গিক আলোড়ন—তোলপাড় নিয়ে হাজির হয়, কখনও বা প্রতীক হয়ে ওঠে। যখন তিনি বলেন:

আমি তোমার নাম বিস্মৃত, মেলুসিনা,
লাউরা, ইসাবেলা, পার্সেফোনা, মারিয়া
তোমার মুখ সকলের মুখ অথচ কারো নয়,
তুমি সকল প্রহরে অথচ ঢেউ নও,
তুমি যেন তরু আর মেঘ,
তুমি সকল পাখি আর একটি মাত্র তারা
যেন তুমি অসিধার···

[আদিত্য শিলা]

কখনও বা রহস্যময়তার অনুভূতিকে এমনভাবে প্রকাশ করেন নৈসর্গিক বাতাবরণ যেন মানুষের মত জীবন্ত—মননশীল হয়ে ওঠে।

স্ফটিকের হিজল আর জলের চিনার,
বাতাসের ভাস্কর্য জলশৈলী
গভীর শিকড় যার সে তবু সহজ নাচেতে,
নদীপথ বাঁকে, এগোয়, পেছোয়, অশ্বক্ষুরে আঁকে
আর সতত আগামী.

নক্ষত্রের নিঃস্বর কক্ষপথ,
কিংবা বসন্তের অনিবার্য ফেরাই
নিলীমিত আঁখি পল্লবের ভিতর
শুদ্ধাবলীর ভবিবাদী জল সারারাত বয়

[আদিত্য শিলা]

লাতিন আমেরিকার যাঁরা বড় মাপের কবি, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কবিতাতেই নিসর্গ এবং মানুষ—প্রকৃতির ঔদার্য এবং মানুষের সংগ্রাম এক হয়ে জীবনের জন্যে বাঁচার জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। পাথ-এর কবিতার মধ্যে এই যুগ্মরূপ দৃষ্ট হয়।

অনুবাদক কবি অতনু রেজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাথ-এর এই দীর্ঘ অসমমাত্রিক একাদশাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতাটি অনুবাদ করে বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন। হিস্পানী ভাষার যে অদ্ভুত ব্যঞ্জনা সেই ব্যঞ্জনা এই অনুবাদে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। ভাষার যে অনুষঙ্গ, যে অনুষঙ্গ অনুবাদের সময় সাধারণত পালটে যায়, সে-সম্পর্কে অতি-মাত্রায় সচেতন থাকার জন্যে কোন কোন জায়গায় কাব্য-রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বড় বেশি আক্ষরিক মনে হয়েছে। ক্রপদী বাঁধুনির কাছাকাছি গিয়েও আটপৌরে কথা বলার ঢঙ পাথ-এর কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়, তা লক্ষণীয় ভাবে অতনু রেজ ধরে রেখেছেন। আর তা তিনি পেরেছেন, কারণ হিস্পানী ভাষার সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর পরিচয়।

মেহিকোর এই বিরাট মাপের কবিকে নিয়ে সম্প্রতি অর্থাৎ তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর, অনেকেই কাজ করছেন। অবশ্য তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে। অধিকাংশই তাঁর নামের উচ্চারণ 'পাজ' করেছেন। হিস্পানীতে 'জেড'-এর উচ্চারণ 'থ' হয়। এই ত্রুটি হয়ত অনেকেই শুধরে নেবেন।

উতলা হোসনে প্রাণ, ধীরে—ফয়েজ আহমদ ফয়েজ / অনুবাদ : নীলাঞ্জন হাজরা / আগামী কলকাতা / ২০ টাকা।

অকৃতাভিও পাথ : আদিত্য শিলা—
অনুবাদ : অতনু রেজ [মূল স্প্যানিস থেকে অনূদিত] / প্রকাশক : মিরান্দা ২৩৮ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪/১৫ টাকা।

তিনটি উপন্যাস : সমকাল, ভূত এবং ভবিষ্যৎ

মেঘ মুখোপাধ্যায়

মহাভারত থেকে একটি উপাখ্যানের উল্লেখে প্রবীণ লেখক বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'মান্ধাতার মুখ' আরম্ভ করেছেন। সেই উপাখ্যানে মান্ধাতার বিচিত্র জন্মরহস্য এবং নামকরণ কাহিনীর বর্ণনা শোনাচ্ছেন এক নাতিকে তার বৃদ্ধ ঠাকুর্দা। প্রায় সাড়ে চারশ পৃষ্ঠার ঠাসবুনোট মুদ্রণে বিরাট মাপের এক উপন্যাস—চরিত্র সংখ্যা, ঘটনার প্রাচুর্য এবং কাল পরিসর মিলিয়ে অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এক পরিশ্রমী লিখনকর্ম সমাধা করেছেন লেখক। এই জাতীয় উপন্যাসের রচয়িতারা সাধারণত সময়ের বৃহৎ পরিসরকে ধরতে জাতির ইতিহাসকে তথা জাতীয় জীবনের ইতিহাসের কোনও অধ্যায়কে অবলম্বন করেন। সেই বিশেষ ঐতিহাসিক কালের মৌলিক চরিত্রকে ধারণ করার জন্য তৎকালীন মনীষীদের নিয়ে আসতে হয় উপন্যাসে। লেখকের সৃষ্ট চরিত্রদের সঙ্গে ইতিহাস বিশ্রুত চরিত্রদের জীবনের যোগসাজসে উপন্যাস আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। লেখক এখানে সেই পথই গ্রহণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে আমরা দেখতে পেয়েছি বিদ্যাসাগরকে। নায়ক সমু বা সম্বিতকে, তার বর্তমান জীবনকে ঘিরে উপন্যাস গড়ে উঠলেও ইতিহাসের টানে লেখক এগিয়ে পিছিয়ে পূর্বযুগের মধ্যেই যেন বিচরণ করেছেন বেশি। সমুর বর্তমান জীবনকাহিনী অর্থাৎ তার নিজের বাস করা যুগের সমস্যা সংকটের চেয়ে লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন তার পিতামহদের যাপিত যুগের ওপর। ফলে উপন্যাসটিতে কোথাও কোথাও ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে।

কলকাতাকে ছাড়িয়ে বাংলার গ্রামে এবং ভারতের নানা জায়গায় কাহিনীর চরিত্রগুলি বিচরণ করলেও উপন্যাসে কলকাতা একটা জীবন্ত চরিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। সে কি সমুর কলকাতা বা নবজাগরণের কলকাতা। কলকাতাকে প্রাণবন্ত চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে লেখক যেমন সফল হয়েছেন তেমনি গ্রাম দেশের বর্ণনাতেও তাঁর কলম সমান পারদর্শী। উপন্যাসের একটি চরিত্রের মুখে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলের বর্ণনার কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে। 'আসলে কি জানিস—আমার মনে হয় মা গঙ্গা বাঁ পাশ ফিরে শোওয়া। তার কোলে ছোট-বড় চড়ার মতো বাচ্চা দ্বীপগুলো। খাড়ি শুড়ির অগুন্তি হাত বাড়িয়ে মা তার ছেলেপিলেদের আগলাচ্ছে। যেন মা-মুরগী ডানা চাপা দিয়ে আগলাচ্ছে ডিম কোটা বাচ্চাদের। ওখানকার মাটির সঙ্গে কি তোর জানা শোনা আছে—' তারপর নরু সমুকে মাটির বিশেষত্বের বর্ণনা শোনায় যা পাঠকদের কাছেও আকর্ষণীয় লাগবে।

সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরেকার এক অচেনা

জল মাটি মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে 'মান্ধাতার মুখ'-এ, আবার আমাদের দিনাদ্দিনের মানুষগুলিরও মুখ মিলবে এখানে। বাংলার গ্রামের মা দিদিমা মাসি পিসি গোত্রীয় মানুষদের মুখের ভাষার চমৎকার কথাবার্তা পড়তে বেশ ভালো লেগেছে। এই ধরনের ভাষা বা বাচনভঙ্গি যা আজ লুপ্তপ্রায়। সবাই সভ্য, শহুরে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধরনে কথা বলতে চায় বলে বাংলার গ্রামের নিজস্ব বাচন-রীতি আজ দুষ্ট হয়ে গিয়েছে।

উপন্যাসটির বিষয় গান্ধীর্যের তুলনায় এর ভাষা উপযুক্ত নয়। একাদ্দিক্রমে কয়েকটি শব্দ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট বাক্য পড়তে এক এক বার ক্লান্ত লাগে। বাক্যগুলির ধরনে একঘেয়েমি এসে গিয়েছে। তাছাড়াও একরকম অসম্পূর্ণ খাপছাড়া বাক্য ব্যবহারের ফলে ভাষার নিজস্ব টান নষ্ট হয়েছে। যেমন—

"সম্বিতের ঘুম ভাঙতে বেশ খানিকটা বেলা। সূর্যি পুবের আকাশে অনেকখানি ওপরে। ঘরের ভেতরে রোদের ছড়াছড়ি। চোখ চাইতেই সামনে রাঙাদিদি। নাওয়া-খোওয়া সারা। জলজলে কাঁচা সোনার রঙ। এতটুকু কলঙ্ক লাগেনি বয়সের। এক মাথা খোলা কালো চুল। ঢাল দিয়ে পিঠে ছড়ানো।"

মাকের পূর্ণচ্ছেদ তুলে দিয়ে 'একমাথা খোলা কালো চুল ঢাল দিয়ে পিঠে ছড়ানো।' লিখলে কী ক্ষতি ছিল? লেখক অবাণিজ্যিক এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধহীন লেখকদের উপন্যাস বের করার জন্য প্রকাশক জোটে না বলে ভূমিকায় আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষার কারণে উপন্যাসটির আয়তন অযথা বেড়ে গিয়েছে। ভাষাকে সংহত এবং সুসংবদ্ধ করলে প্রকাশের মুদ্রণ ব্যয় লাঘব হত বলে মনে হয়। যাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে না যায় সম্ভবত সেই চিন্তা থেকে বইটিতে পরিচ্ছেদ ভাগ চোখে পড়ে না বললেই চলে। পাতার পর পাতা বিরতিহীন একই পরিচ্ছেদ চলতে থাকে—পাঠকের চোখের পক্ষে এ যেমন ক্ষতিকর তেমনি গ্রন্থের মুদ্রণ পারি-পাট্যের বিচারেও শ্রীহীন।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অগ্নিস্রোত' এক দিক দিয়ে আগের আলোচিত বইটির সমগোত্রের। অগ্নিস্রোতেরও পটভূমি এক ঐতিহাসিক কাল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ, যদিও এই উপন্যাসে কোনো ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্র নেই। অগ্নিস্রোতের চরিত্রগুলি উঠে এসেছে ওই সময়ের বাংলাদেশের অগণিত সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে। তারা হল যেমন শরৎ, সুব্রত, মহিম, বীরু সেন, সনাতন, রূপা, অপর্ণা…।

কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ার ভয়ের হিড়িকে একটা পরিবার কলকাতা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে কাশিতে—এইরকম এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের শুরু। বাড়ির এক ছেলে কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে কলকাতায় রয়ে গেল কলেজ কামাই না করার অজুহাতে, আসলে এই তরুণ চাইছিল সেই সন্ধি-ক্ষণের মহানগরের বাসিন্দা হয়ে জীবনটাকে নতুন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করতে। একদিকে বিশ্বযুদ্ধের আবার অন্যদিকে ভারত ছাড়ো বা আগস্ট আন্দোলনে উত্তাল কলকাতার বুকে শরৎ তার উদ্দাম তারুণ্য নিয়ে বিচিত্র জীবনের মুখোমুখি হল। লেখক একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরো দুটি পরিবারের কাহিনী বয়ন করেছেন উপন্যাসে। দেশের এক ঐতিহাসিক লগ্নে কয়েকজন যুবক এবং তাদের পরিবার কীভাবে জীবন-যাপন করেছিল সেই চিত্র এঁকেছেন লেখক। এই কালপর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাজন ঘটে যায়—এক ভাগ যুগের কঠিন আঘাত সহ্য করতে না পেরে লড়াইয়ে হেরে গিয়ে দরিদ্র বা গালভারি ভাষায় নিম্নমধ্যবিত্ত বনে গিয়েছিল, অন্য মুষ্টিমেয় এক অংশ নানারকম ব্যবসা করবার দালালি করে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কোঠায় উঠেছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিকাশ বা বিপন্নতার পর্বটিকে 'অগ্নি-স্রোত' উপন্যাসে লেখক চিহ্নিত করতে সফল হয়েছেন—এই বিচারে উপন্যাসটি পাঠযোগ্য। যদিও তিনি বিবরণধর্মী উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু সেই সময়ের সমাজ ও মানুষগুলির কার্যধারা সম্বন্ধে কঠিন প্রশ্ন তুলতে দ্বিধা করেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার রাষ্ট্র পরিচালন কর্তারা তীব্র কমিউনিস্ট ভীতির শিকার হয় এবং কমিউনিজম আতঙ্কগ্রস্ত উন্মাদ প্রশাসন একে একে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই মতবাদ পোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে থাকে, তাদের ওপর নেমে আসে নানারকম অপমান ও নির্যাতন—এই বিষয় নিয়ে হাওয়ার্ড ফাস্টের বিখ্যাত উপন্যাস সাইলাস টিমবারম্যান বাংলায় অনুবাদ করেছেন সলিল বিশ্বাস। বিশ্ববিজ্ঞালয়ের অধ্যাপক টিমবারম্যান আর পাঁচ-জন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রী সন্তানের ছোট সংসার নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিলেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। বিদ্যাচর্চা, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা আর পারিবারিক জীবনের বেশি তাঁর কিছু অভিলাষ ছিল না। কিন্তু তিনি সরকার পরিচালিত নাগরিকদের ভেতর যুদ্ধভীতি প্রসারের

উদ্যোগের বিরোধিতা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় শহরে সরকারের ধামাধরা অধ্যাপক-কর্তৃপক্ষমণ্ডলী নাগরিক প্রতিরক্ষা কমিটি গড়ে তুলতে চাইলে তিনি তাতে নাম লেখাতে অস্বীকার করলেন। তিনি মনে করতেন না যে পৃথিবীর অন্য কোনও শক্তির আমেরিকার মাথায় বোমা ফেলার মাথা ব্যথা আছে। এই উপন্যাসের ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পঞ্চাশের দশকের। তখন নানা পর্যায়ে কমিউনিস্ট শিকার তুঙ্গে। এবং সরকার নাগরিকদের কাছ থেকে দেশপ্রেমের প্রকট প্রমাণ আহরণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যে সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো দেশপ্রেমের নিদর্শন মিলছে না তাকেই কমিউনিস্ট তথা দেশদ্রোহী রূপে দেগে দেওয়া হচ্ছে। টিমবারম্যানের মতো সাধারণ বুদ্ধিজীবী ত কোন ছার, এই শতাব্দীর মহত্তম সন্তানদের অন্যতম চ্যাপলিনকেও আমেরিকার সরকার একই ফাঁদে ফেলে যারপরনাই অপমান হেনস্থা করে ছেড়েছিল—সেই ভীতিপ্রদ সংবাদ আজ সর্বজন গোচর।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র একটা আবেদনপত্র প্রচার করা হয়েছিল এই মর্মে যে চিরকালের মতো আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হোক। এই আবেদনে টিমবারম্যানও স্বাক্ষর করেছিলেন। টিমবারম্যানকে নিয়ে সবচেয়ে ঝামেলা বাধে মার্ক টোয়েনের একটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাসঘরে করা তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে। টোয়েনের গল্প 'দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলিবার্গ'কে টিমবারম্যান মনে করেছিলেন অত্যন্ত সুলিখিত একটি ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী, লোভ আর ভণ্ডামির ওপরে অসামান্য একটি কশাঘাত। আমেরিকান সাহিত্যের অন্য সমস্ত ভালো গল্পের মতোই সুর এবং বিষয়বৈগুণ্যে খাঁটি আমেরিকান যে কোনও স্বাভাবিক মানুষই এই গল্পটি পড়লে লাভবান হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই মতের বিপক্ষে গিয়ে মনে করল যে গল্পটায় কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার করা হয়েছে এবং আজ ওই গল্প সম্বন্ধে টিমবারম্যান যে মত প্রকাশ করেছেন তাতে তা কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতেই সাহায্য করবে। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বড় ঝড় উঠল এবং অনেকদূর গড়াল।

নানা অভিযোগ জড়িয়ে টিমবারম্যানকে আদালতে তোলার পর বিচারে তিনবছর কারাদণ্ড হল। বছর কয়েক আগে সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন হয়ে গিয়েছে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিজমের ভয় থেকে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে—এই রকম এক পরিপ্রেক্ষিতে 'সাইলাস টিমবারম্যান' পড়ার অভিজ্ঞতা পাঠককে নিশ্চয় নতুন চিন্তায় উদ্দীপ্ত করবে। উপন্যাসটিতে আমেরিকার একরোখা যুদ্ধবাজ নীতির বিশ্লেষণ এবং নিন্দা—এর একটি প্রধান দিক যা নিয়ে ইউরোপীয় কমিউনিটির রাষ্ট্রগুলিসহ আজ সারা বিশ্ব চিন্তিত। একজন সাধারণ মানুষের যৎসামান্য শক্তি এবং প্রবল শুভবুদ্ধি সম্বল করে অধ্যাপক টিমবারম্যান পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে যে শুভচেতনার লড়াই শুরু করেছিলেন এবং সেই নিয়ে যে উপন্যাস তার আবেদন আজকের একমেরু বিশ্বে নিশ্চয় সাধারণ পাঠকদের মনোযোগ কাড়বে।

মাঙ্কাতার মুখ—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় / অভিব্যক্তি, ২০১ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৫৪ / ১০ টাকা।

অগ্নিস্রোত—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় / রূপা, কলকাতা-৭৩ / ৬০ টাকা।

সাইলাস টিমবারম্যান—হাওয়ার্ড ফাস্ট অনুবাদ : সলিল বিশ্বাস / পিপ্‌ল্‌স বুক সোসাইটি, কলকাতা-৭৩ / ৪০ টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার কয়েকজন

কামাল হোসেন

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' এই ঋষিবাক্য শিরোধার্য করেও একথা হয়ত একেবারে নিরর্থক নয়, কবিতার অন্যোন্যোবাধক স্রষ্টারা সকলেই দাবি করতে পারেন না অমরতার।

তবু ত দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে কেউ কেউ কৃষিকাজ করেন, জীবনমৃত্যুর ঔদাস্যে কাজের গোলাতে ওঠে সোনার ফসল, কেউ শুধু নিষ্করুণ বন্ধ্যা ফনিমনসায় কণ্টকিত বিষাক্ত ধূসর মাঠে একা একা বসে থাকেন, বাঁশি বাজান।

অর্থাৎ প্রচারের আলো ও প্রতিষ্ঠার স্থিতি যাঁদের স্পর্শ করে না, মন্থর কালের স্রোতকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের

সাধ্যমতো মেধা ও আবেগের স্তূপীকৃত বারুদে তাঁরা ঠিকই সলতে পাকিয়ে যান। সংক্ষেপে, কবিতা লেখেন।

এসব কবিতা কালকে অতিক্রম করতে পারে কিংবা নাও করতে পারে। কিন্তু তার জন্য এসব অল্প-পরিচিত কিংবা অনামী কবিদের শব্দের সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। নিবৃত্তি ও নির্বাণের সত্যিই কি কোনও যথার্থ অর্থবহ সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া সম্ভব একজন কবির জীবনে?

রমেন আচার্যর কবিতা অনেকদিন ধরে পড়ছি। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের শিরায় শিরায় জীবন সম্পর্কে এক আশ্চর্য মমত্ববোধ ও অভিমান কাজ করে যায়।

কোথাও যেন দমচাপা আলিঙ্গনের অন্ধকারে জেগে ওঠে আদিম মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাবধারার কিছু ছিন্নভিন্ন প্রত্নচিহ্ন। 'নোঙরের জন্য ভূমি' কাব্যগ্রন্থে রমেন খুঁজে নিতে চেয়েছেন তাঁর প্রার্থিত স্বদেশ। আর সমুদ্রে সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে ঘুরে বেড়ানোর নাবিকের দিন বোধহয় তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে না সংসারের ও মাটির ধারাবাহিকতা থেকে। 'ফোর কোয়ার্টেট্‌সে'র এলিঅটের মত সময়কে কখনও বৃত্তাকার ভাবেন কবি। আর তখন বুঝি জীবনের শুরু ও শেষ ও শুরুর মধ্যে কোনও যতিচিহ্ন থাকে না। এ এক অখণ্ড চলা। খুব নিশ্চিন্তভাবে রমেন এভাবে লেখেন: "কলমের মুখে ঘুরেফিরে আসে মধ্য রাত্রির জ্বর ও জলপটি। / ঠোঁট থেকে কথা উড়তে থাকে ঘরময়। উড়তে থাকে / হাক গৃহস্থ পায়রা। আঙুল ছুঁইয়ে ডেকে নিই ঘোর থেকে / রঙিন ভূখণ্ড ও সময়কে। সে কি ফিরে যাবে আবার!" (বিদায়কালীন পা)

তাঁর 'বাতাস থেকে বেদনাবোধ' কাব্যগ্রন্থে খুব নিরাসক্ত গলায় তিনি উচ্চারণ করেন: "দিবা স্বপ্নে দেখি ফুটপাথ চৌচির করে ফোটে ফুল, / ভিড় ও ঘামের মধ্যে স্বপ্ন দিয়েছে শীতল ঝর্ণার সাদা ফেনা। / এরই মধ্যে আচমকা ট্রামের জটিল তার ছিঁড়ে / হল্লাগাড়ির মত ছুটে আসে ক্রুদ্ধ ঐরাবত! তার / থামের মতন উত্থিত পায়ের নিচে পড়ে থাকে / লোভ ও উৎকোচ, ঈর্ষা ও শোষণ, পড়ে থাকে / আমাদের সমস্ত মুখোশ।" (মানুষের করস্পর্শ)

মতি মুখোপাধ্যায় আমার একজন প্রিয় কবি ও গল্পকার। জীবনের কিছু প্রকীর্তিত ক্ষয় ও অব্যর্থ ধ্বংসস্তূপ কবিতার ছন্দে তিনি গাঁথতে ভালবাসেন। বলা যেতে পারে, দিগন্তের থেকে আর একটু ছাড়িয়ে হেঁটে আসতে তিনি বেশ উপভোগ করেন। একটা শান্ত ও নির্লিপ্ত ভাবের আড়ালে তিনি ফুটিয়ে তোলেন এই সময়ের যন্ত্রণা: "অমোঘ সত্যের শব্দ, কোন স্কুলে কার হল ছুটি / ভাবনা অসার জেনে নাকি ভয়ে দূরে চলে গেলে / মহাশূন্য শান্তিময়, নক্ষত্রেরা জলন্ত বিশ্বাসে / যেরকম শুদ্ধ থাকে নিজস্ব অভ্যাসে একা একা চেয়েছিলে সেভাবেই দূষণের থেকে দূরে যেতে যেন বাঁচে মেধা, স্বার্থ অকারণ অপচয় থেকে।" (ঘণ্টা বাজে)

মাঝে মাঝে অবশ্য এই নির্লিপ্তভাব আর রক্ষা করতে পারেন না মতি। রীতিমত উত্তেজিত গলায় তিনি বলেন: "তামাম ভারতে আজ রবিবার / সন্ত্রাসে যেন হিংস্র আঁধার / সবচোখ সারিবদ্ধ, কসাই খানায় / যেন বা স্বদেশ আজ ছাগ হয়ে উল্টো ঝুলে আছে।" (আজ রবিবার)

একজন যথার্থ বিবেকবাদী শিল্পী হিসেবে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়েন এই অহরহ অন্যায়ের বিপক্ষে: "উঠে এস দিব্য ক্রোধ / উঠে এসো সজাগ সময় / সৈন্যসজাগ এসো ভবে দীর্ঘসারি সুপারি বৃক্ষরা / অরক্ষিত জীবনের তটরেখা ধরে।" (উঠে এসো দিব্যক্রোধ)

মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে সব সময় জেগে থাকে একটি নসট্যালজিক অনুভূতি, হয়ত শৈশব কিংবা বয়ঃসন্ধির হেমন্তলাঞ্ছিত রিক্ত মাঠ, কুয়াশায় ঢাকা স্বপ্নময় অস্তাকাশ। তাঁর 'স্মৃতিময় স্বরলিপি' কাব্যগ্রন্থে এধরনেরই কিছু নির্বাসিত ধ্বনি খেলা করে গেছে স্মরণের আনাচে কানাচে। এক ভয়ংকর শূন্যতাকে স্পর্শ করার জন্যই বুঝি লেখেন: "এখানে এখন কোন বোধের সাম্রাজ্য নেই, নেই রাজ্য, / ছিট মহল। শুধু এক বলয়িত অনীহা-আঁধার, / অথবা অদ্ভুত যত আশাহত আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নিল ক্ষত / নিরাশা চড়াই। কণামাত্র বোধটুকু—অন্তর্লীন, মৃত্যুমগ্ন / হ্রদের শীতল জলে অনাবর্তে নিঃশেষিত প্রায়।" (আবার ফিরিয়ে দাও আমাদের বোধের সম্পদ)

'শবাধারে আমি' কাব্যগ্রন্থে মানিকের কণ্ঠস্বর কিছুটা পালটিয়েছে। ধূসরিত গোধূলির ছায়া আর বুঝি তাঁকে কিছু ফিরে হাঁটতে সম্মোহিত করছে না। বোধহয় প্রেমের মতো কোনও সংবদ্ধ নির্বাণের উপর বিশ্বাস হারিয়ে তিনি লেখেন: "হৃদয়ের পোড়া গন্ধে জীবন দুর্ভার। / বুঝি তাই: নির্বেদ জীবন সত্য, / ভালোবাসা শব্দ শুধু / বহু ব্যবহারে মূল্যহীন, অথবা / নগদ মূল্যে কেনা এক সবুজ শিফন শাড়ি।" (ভালোবাসা: শব্দ শুধু)

অচিন্ত্য নন্দীর কবিতা লেখার হাতটি মন্দ নয়। তাঁর দেখবার চোখও রয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৩-র মধ্যে রচিত কবিতার এই সংকলনটিতে অবশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে একজন সৎ কবির স্বপ্ন এবং নির্মাণের পরিশ্রমী রাত্রিযাপন। এই প্রতিবন্ধী সময়ের সীমাবদ্ধ আয়োজনে জীবনের গ্লানি ও পরাজয়ের নীলাভ বেদনাকে খুব আন্তরিকভাবে ফুটিয়ে তোলেন কবিতার লাইনে : "একা একা ঘুরছি আর ঘুরছি, আর নীলপাড়া অরণ্যের / মাঝে (নীল !) যন্ত্রণার নীল কি ব্যপ্ত সুন্দর। / জীবন : যেভাবে কাকেরা ছড়ায় এঁটো, খুঁটে খায়। / কালজানি নদী জানে, মধু চা বাগানের শিরিষ গাছেরাও। / জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের ইউনিয়ন একাডেমি ইস্কুলে ?" (নিম্ন উপত্যকা)

'ঘোড়সওয়ার' কবিতা পত্রিকার সম্পাদক উজ্জ্বল সিংহের কাব্যগ্রন্থ 'লিপিবদ্ধ বিভ্রম'-এর কয়েকটা লাইন কবিতা পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে। উজ্জ্বলের কবিতা যেন নস্টালজিক স্মৃতির কুরুশে বোনা নিথর জীবন-অভিজ্ঞতা দ্রুত মিলিয়ে যায় ছায়ার মধ্যে, কিংবা স্বপ্নের মধ্যে, অনেকটা ইয়েট্‌স-এর ভাষায়—"Dream, Dream, for this is also sooth." উজ্জ্বল নিজে বলেন এভাবে : "প্রকৃতি এখন ধ্বস্ত নগরী, তার উলঙ্গ শরীরই কবিতা। / দৃষ্টি ডুবেছে কালো সমুদ্রে / সাদা পাখিগুলি প্রতিটি ঠাণ্ডা।" (রূপান্তরিত)

নোঙরের জন্য ভূমি—রমেন আচার্য / একুশে ১৩১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ / ৭ টাকা।

বাতাস থেকে বেদনাবোধ—রমেন আচার্য / একুশে / ১০ টাকা।

উঠে এসো দিব্য ক্রোধ—মতি মুখোপাধ্যায় / মহাদিগন্ত বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা / ১০ টাকা।

স্মৃতিময় স্বরলিপি—মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় / কালচেতনা প্রকাশনী কলকাতা ৩৪ / ৮ টাকা।

শবাধারে আমি—মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় / কালচেতনা প্রকাশনী / ১০ টাকা।

কালজানি নদী জানে—অচিন্ত্য নন্দী / সমন্বয় কলকাতা ৬০ / ৭ টাকা।

লিপিবদ্ধ বিভ্রম—উজ্জ্বল সিংহ / স্বর্ণাক্ষর হাওড়া ১ / ৬ টাকা।

স্ত্রীদেবতা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পুরুষ এবং স্ত্রী অবিচ্ছেদ্য অন্যোন্যনির্ভর এই দুই শক্তির মিলনে সৃষ্টির উদ্ভব ও প্রবহমানতা—সভ্যতার আদিকাল থেকে বদ্ধমূল এ ধারণা শিল্পে সাহিত্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শুধু এ দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যগ্রন্থ ঋগ্বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য, কিন্তু ঋগ্বেদ পরবর্তী যজুর্বেদের / বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, কেন-ও-মুণ্ডক-উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রী দেবতার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে। ঋগ্বেদ পূর্ববর্তী সিন্ধু সভ্যতা (২৩০০-২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-র যুগে কিন্তু অন্য চিত্র : সেখানে স্ত্রীদেবতারাই যেন বাড়বাড়ন্ত। সিন্ধু সভ্যতার কিছু আগে বেলুচিস্তানের ঝোব্ অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতির পোড়া মাটির আবক্ষ নারী মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ মাতৃরূপী আদ্যতন নারীসত্তার পরিচয় বহন করছে। সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন ও অল্পবিস্তর আগে-পরের, বিশ্বসংস্কৃতির খোঁজ নিলে দেখা যাবে সুদূর গ্রীস থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। এবং এই স্ত্রীদেবতা মূলতঃ জগজ্জননী ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্যান্য রূপেও আরাধিত হতেন, কখনও পতিদেবতার অবিচ্ছেদ্য সহচরীরূপে, কখনও দুষ্টের দমনকারিণীর ভূমিকায়, কখনও বা বরদাত্রীর বেশে, কিন্তু তাঁর মূল জননী চরিত্র সব সময়েই অব্যাহত ছিল। একটু অন্যভাবে, আমাদের সনাতনী ভারতচিন্তার কেন্দ্রে বিদ্যমান একজন দেবী বা মহাদেবী, তিনি জগজ্জননী, অনন্ত মহাশক্তির আধার এবং সৌম্য ও উগ্র উভয় রূপেই তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করেন, ভক্তদের কল্যাণে, বিশ্বচরাচরের কারণে। সাধারণ্যে তিনি মহাদেব-জায়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গানামে পরিচিতা, কিন্তু অন্য দেবতাদের সঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থিত—বিষ্ণুর লক্ষ্মী, ব্রহ্মার সাবিত্রী ও গায়ত্রী (এবং সরস্বতী), কার্তিকের দেবসেনা, অগ্নির স্বাহা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁদের 'শক্তি' বা ভার্যার ভূমিকায় ; আবার কখনও বা কন্যার বেশে—গিরিরাজ ও মেনকার দুহিতা দুর্গা, দুর্গা-শিবের কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সাধারণতঃ তিনি শান্ত ও কোমল প্রকৃতির, কিন্তু প্রয়োজনে উগ্ররূপিণী ; সমস্ত পুরুষ দেবতার পুঞ্জীভূত শক্তির

মূর্তরূপে মহিষাসুর বধে উদ্যত মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, অন্ধকাসুর নিধনের জন্য বিভিন্ন দেবতার শক্তিরূপিনী মাতৃকা—ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, মহেশ্বরের মাহেশ্বরী।

রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ মুখলেসুর রহমান মহাদেবীর এই বিশেষ 'মাতৃকা' রূপ নিয়েই বর্তমান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ডঃ রহমান ১৯৬৩-৬৫ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে Mother Goddess অভিসন্দর্ভের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। অলোচ্য বইটি সম্ভবতঃ সেই গবেষণাগ্রন্থের অধ্যায় বিশেষের পরিবর্ধিত রূপ। যাই হোক, বাংলা ভাষায় 'মাতৃকা' নাম্নী দেবীর রূপ প্রমূর্তির বিশদ আলোচনা করে তিনি হিন্দু মূর্তিতত্ত্ববিদদের শুধু নয়, সাধারণ সংস্কৃতি-প্রেমী বঙ্গভাষীদেরও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। দৃশ্যতঃ এই পুস্তক একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সংস্কৃতিবিজ্ঞানের ন্যূনতম খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে-কোন ধর্ম সম্পৃক্ত দেবদেবীর প্রতিকৃতি আসলে একটি স্থানকাল-ধৃত জনমানসের প্রত্যক্ষগোচর রূপ-প্রমূর্তি, শিল্পগুণে সে সব মূর্তিরূপের কোন কোনটি দেশোত্তীর্ণ হতে পারে। দা ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' দেখার সময় ও দেখার পরে মনে হয় না এ ছবির বিষয়বস্তু খ্রীস্টধর্মীয়, দক্ষিণ ভারতীয় চোল যুগের ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তির প্রণেতা ও উপজীব্য শৈব কি না এ প্রশ্ন কোন দর্শক প্রথম দর্শনে কখনও করেছেন কিনা জানা নেই।

এই সংস্কৃতিবিজ্ঞানীর চোখ ও মন নিয়েই ডঃ রহমান তাঁর Mother Goddess রচনা করেছিলেন এবং সম্প্রতি উপহার দিয়েছেন অনতিদীর্ঘ 'মাতৃকা' বইটি। ব্রাহ্মণ্য মহাকাব্য-পুরাণ তন্ত্র গ্রন্থাদিতে মাতৃকাদের প্রথায়িত সংখ্যা সাত : ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা—যথাক্রমে ব্রহ্মার, মহেশ্বর বা মহাদেবের, কুমার কার্তিকেয়র, বিষ্ণুর, বিষ্ণুর বরাহরূপের, ইন্দ্রের ও শিবের উগ্ররূপের (ভৈরবের) শক্তি। একাদশ শতকের আরব মনীষী আলবীরুনি তাঁর হিন্দ্ বা ভারতবিষক গ্রন্থে মাহেশ্বরীর পরিবর্তে নাম করেছেন ভগবতী-র (এক হিসাবে ভগবতীও শিবের শক্তি মাহেশ্বরী)। সপ্তমাতৃকা রূপে পরিচিতা এই মাতৃকাগোষ্ঠী সাহিত্যে ও শিল্পে বহুলতায় রূপায়িত এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সহ এই উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সপ্তমাতৃকার অনেক ভাস্কর্য-ফলক পাওয়া গেছে। সাধারণভাবে মাতৃকার সংখ্যা সাত হলেও পুরনো পুঁথিপত্রে ও ঐতিহ্যে গৌরী প্রভৃতি ষোল জন মাতৃকার (গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকাঃ) উল্লেখ মেলে এবং ভাস্কর্য-কলার অষ্ট মাতৃকা ও নব মাতৃকারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যদিও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবে। নব মাতৃকার, একটি বিরল নিদর্শন আছে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে এবং আলোচ্য গ্রন্থে তা প্রত্যাশিতভাবে বর্ণিত (পৃ. ৯৫-৯৬ চিত্র ৪১) : রাজশাহী জেলার একটি গ্রামে পাওয়া দশম শতকের এই ভাস্কর্য ফলকে সপ্ত মাতৃকার সঙ্গে চিত্রিত অন্য দুই মাতৃকা হলেন মহিষমর্দিনী ও সিংহবাহিনী এবং লেখক যথার্থই বলেছেন : 'সম্ভবতঃ সপ্ত-মাতৃকার সঙ্গে শেষোক্ত দুজনের মূর্তির উপস্থিতির দরুন পরিচয়-ফলকে নিদর্শনটি নবমাতৃকা নামে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে, নচেৎ মহিষমর্দিনী ও সিংহবাহিনী দুর্গাকে মাতৃকা পর্যায়ভুক্ত করার কোন কারণ নেই' (পৃ. ৯৬)। অষ্টমাতৃকা-সংক্রান্ত একাধিক সাহিত্যসূত্র আছে নারসিংহী (বিষ্ণুর নর-সিংহ রূপের শক্তি)-এর নাম, কিন্তু বাস্তবে তিনি অষ্ট মাতৃকার ফলকগুলিতে অনুপস্থিত, যদিও তাঁর স্বতন্ত্র দু'চারটি মূর্তির কথা একেবারে অজানা নয় এবং এমন একটি নিদর্শন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ; এটির প্রাপ্তিস্থান মধ্য প্রদেশের সাতনা, এবং নির্মাণকাল দশম শতাব্দীর শেষ কিংবা একাদশ শতকের প্রথম দু-তিন দশকে। ডঃ রহমান সিংহবাহনা সিংহমুখী অষ্টভূজা এই দেবী মূর্তির ছবি ছেপেছেন (চিত্র ২৪)।

সপ্তমাতৃকা / অষ্টমাতৃকা ফলকের শুরুতে অর্থাৎ প্রথমা দেবীর ডান দিকে থাকেন বীরভদ্র (শিবের একটি রূপ) এবং সর্বশেষে অর্থাৎ শেষতমা মাতৃকার পরে গণপতি বা গণেশ। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যাশিতভাবে মাতৃকারা স্ব স্ব পতির বা শক্তির (পুরুষশক্তির) রূপবৈশিষ্ট্য লাঞ্ছন ও বাহন সমন্বিতা। তৃতীয়তঃ, তাঁদের কোলে থাকে পুত্র সন্তান, তাঁদের মাতৃকারূপের পরিচায়ক হিসাবে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো সপ্তমাতৃকার মূর্তিতত্ত্বের পরিণত ও প্রথাগত-রূপ, গুপ্তযুগেই যার সাক্ষাৎ মেলে এবং মথুরা মিউজিয়ামে এর একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় দৃষ্টান্ত (৫৫২ সংখ্যক) বিদ্যমান। এই সব নিদর্শনে মাতৃকারা সাধারণতঃ দাঁড়ানো অথবা সমাসীন অবস্থায় প্রদর্শিত, কিন্তু তাঁদের নৃত্যপরা ভঙ্গীতেও কখনও কখনও দেখা যায়, যেমন জয়পুর মিউজিয়ামের অষ্টম শতকের ফলকটিতে (লেখক এর কথা বলেন নি), অথবা উদয়পুর মিউজিয়ামের বারাহীর নবম-দশম শতকের দৃষ্টান্তে (চিত্র ২৩)

মাতৃকাদের যৌথ রূপায়ণ কত পুরনো? প্রথম থেকেই কি মাতৃকারা সংখ্যায় সাতজন ছিলেন? প্রথম থেকেই কি তাঁরা ব্রহ্মা-মহেশ্বর-ইন্দ্রকুমার (কার্তিকের)-দের রূপবৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? বিদগ্ধ লেখক এ সব প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, মাতৃকাদের প্রাচীনতম রূপায়ণের নিদর্শন কুষাণযুগের, মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ের। মথুরা মিউজিয়মে F. 38 ও F. 39 সংখ্যক ফলক দুটি এই সময়ের; এদের প্রথমটিতে সাত জনমাতৃকাই উপস্থিত, তাঁদের দক্ষিণ হাত অভয়মুদ্রায় বিন্যস্ত, তাঁরা পাদপীঠের উপরে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে কুমার কার্তিকেয় (বীরভদ্র বা গণেশ নন), দ্বিতীয়টিতে পাঁচজন মাতৃকা ভদ্রাসনে (দু পা ঝুলিয়ে) উপবিষ্ট, তাঁরাও অভয়হস্ত এবং কুমার-কার্তিকেয়র সঙ্গিনী; এই দু'টি ভাস্কর্য-ফলকেই কিন্তু তাঁদের কারও কোলে ছেলে নেই। ছেলে-কোলে মাতৃকার রূপচিত্র অবশ্য কুষাণযুগেও তৈরি হয়েছিল, সম্ভবতঃ তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শেষ দিকে এবং মথুরা মিউজিয়মেরই F. 31 ও F. 34 সংখ্যক উদাহরণ দু'টি তার প্রমাণ। এদের প্রথমটিতে মাতৃকার সংখ্যা চার, দ্বিতীয়টিতে তিন, প্রত্যেকটিতেই তাঁরা ভদ্রাসনে সমাসীনা। ছেলে দেখা গেলেও কুষাণ যুগের কোন নিদর্শনেই বীরভদ্র ও গণেশ নেই, এই দুই সহচর দেবতার উপস্থিতি দেখি গুপ্ত যুগের শেষ দিকের ভাস্কর্যে—যেমন উত্তরপ্রদেশের দেওগড়ের কাছে ষষ্ঠ শতকের একটি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ সপ্তমাতৃকার প্রতিকৃতিগুলির (অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত) সঙ্গে বীণাধর শিব (শিবের প্রথাগত বীরভদ্র রূপ নয়) ও গণপতিকে। সপ্তমাতৃকারা তাঁদের প্রায় পূর্ণাঙ্গ রূপবৈশিষ্ট্যে প্রতিজ্ঞাত মথুরা মিউজিয়মের ৫৫২ সংখ্যক ফলকে (যার উল্লেখ একটু আগে করেছি)। ডঃ রহমান নৃত্যপর স্বতন্ত্র মাতৃকার উল্লেখ করেছেন (বারাহী, পৃ. ৬৩, ইন্দ্রাণী পৃ. ৬৮); বরোদা মিউজিয়মের নৃত্যশীলা কৌমারীর প্রতিমাটিকে তাঁর তালিকায় সংযোজিত করতে পারেন।

আলোচ্য গ্রন্থের বিশিষ্ট ও তথ্যসমৃদ্ধ অংশ চামুণ্ডা সংক্রান্ত (পৃ.৬৯-২৪)। তিনি দাঁড়ানো, বসা বা নর্তনপরা যে-কোন রূপেই চিত্রিত হতে পারেন। শব ছাড়া উলূক (পেঁচা)-ও তাঁর পরিচায়ক বাহন হতে পারে যেমন ভুবনেশ্বরে পরশুরামের মন্দিরে (৭ম শতক) (লেখক এর উল্লেখ উল্লেখ করেন নি), এবং দন্তরা, সিদ্ধযোগেশ্বরী, রূপবিদ্যা ইত্যাদি তাঁর বিভিন্ন রূপভেদ আছে। ডঃ রহমান মোটামুটি-ভাবে চামুণ্ডা সম্পর্কে সর্বাঙ্গীন আলোচনা করেছেন এবং বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের সংগ্রহে যে সব চামুণ্ডামূর্তি আছে তার বিস্তারিত খবরাখবর দিয়ে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। চামুণ্ডা দেবীর উগ্ররূপ এবং মূলতঃ তান্ত্রিক ধ্যানধারণার শিল্পরূপ। দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে পূর্ব ভারতে, বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে, তান্ত্রিক কৃষ্টি কতখানি প্রাধান্য লাভ করেছিল বরেন্দ্র মিউজিয়াম সহ অন্যান্য মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ও বিভিন্ন মন্দিরগাত্রের চামুণ্ডা মূর্তিগুলি তার প্রমাণ। শুধু পূর্ব ভারতে নয়, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানেও চামুণ্ড উপাসনার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। প্রসঙ্গতঃ, রাজশাহীর অন্যত্র দ্বিভুজ চামুণ্ডার মতো উড়িষ্যার বেরাবোইর ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরেও একটি প্রতিমা বিদ্যমান।

ডঃ রহমানের 'মাতৃকা' বইটি ব্রাহ্মণ্য মহাদেবীর বা প্রকৃত অর্থে বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত ধর্মাতীত আদিম মহাশক্তির মাতৃকা নামে বিশেষ রূপপ্রমূর্তির অনতিদীর্ঘ কিন্তু তথ্যবদ্ধ প্রাঞ্জল আলোচনা, এবং সেই কারণে সংস্কৃতি বিজ্ঞানে উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। মনে রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রকাশিত জার্নাল, বুলেটিন ও প্রাসঙ্গিক বইপত্র বাংলাদেশে বিশেষ রপ্তানি হয় না এবং লেখকের খেদোক্তি আমাদেরও খেদোক্তি: 'প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার গবেষণা কর্মের জন্য যথেষ্ট তথ্যপুস্তক বাংলাদেশের কোন গ্রন্থাগারে নেই।' (পৃ. নয়)। এ ধরনের বাস্তব অসুবিধা সত্ত্বেও ডঃ রহমান তাঁর সীমিত সাধ্যের মধ্যে তাঁর মূল্যবান গবেষণার ফল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এজন্য তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। একচল্লিশটি ফটোগ্রাফে সমৃদ্ধ বইটি তিনি ইংরেজিতে না লিখে বাংলায় লিখেছেন, এ জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে।

মাতৃকা—মুখলেছুর রহমান / বাংলা একাডেমী, ঢাকা / বাংলাদেশ মুদ্রায় ৫০ টাকা।

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের প্রয়াস

কান্তি গুপ্ত

উনিশ শতকের নব জাগরণে বঙ্গদেশের সকল মনীষী, আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনার মধ্য দিয়ে মহাজাতি গঠনের পথ খুঁজে-ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আস্তিক। তাঁর কাছে পরম পবিত্র সেই পারসিক বচন: 'মানবকুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।'[১] ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর সে অর্থে নাস্তিক, কে বলবে? দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ছিলেন ভগবৎ বিশ্বাসী। দেবেন্দ্র-নাথের উচ্চাশা জেগেছিল, 'যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে এবং অব-শেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।'[২] কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আদর্শগত ঐক্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে-ছিলেন। ব্রাহ্ম সাধকের আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, 'প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে ভালবাসিতে হইবে,…পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম এক একটি অমূল্য রত্ন।'[৩] রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ে সাধনা, 'যত মত তত পথ' মূর্ত হয়ে ওঠে বিবে-কানন্দের চিন্তা-তরঙ্গ বৈচিত্র্যে। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোড় দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক? সে ধর্ম না পৈশাচিক নৃত্য?'[৪]

সে যুগে হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খ্রীস্টান, যে কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা যাক না কেন, সেদিন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই ছিলেন মানব কল্যাণে বিশ্বাসী। বিভিন্নতার মধ্যে ছিল গভীর সমধর্মিতা, সর্ববৈচিত্র্যের গভীরে একাত্মতার আস্থা। মীর মশাররফ হোসেনের কথা মনে পড়ে। হিন্দু মুসলমান মিশনের জন্যে তাঁর হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণীয়। তিনি লেখেন, এই বঙ্গ-রাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক—সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখ দুঃখে সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই।' মীর মশাররফ 'চিরসহযোগী (হিন্দু) ভ্রাতার মান রক্ষা ধর্মরক্ষার' জন্যে মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন, 'ধর্মে আঘাত লাগে, গো মাংস পরিত্যাগ করিলে ঘর-কন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না।…এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি?[৫] 'ইসলাম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'শান্তির মধ্যে আত্মস্থ হওয়া।'[৬] মীর মশাররফ ইসলামের বাণীকে ধ্বনিত করেছিলেন।*

উনিশ শতকের অন্য সাধনায়, হিন্দু মুসলমান সম্মিলনের প্রয়াসে পূর্বগামীদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ বেশি মনে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান মিলনের সংকল্প তাঁর লেখনীতেই সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল। তার উজ্জ্বল মূর্তি বহন করছে রেভারেণ্ড কণ্টারের 'দি রোমান্স অব হিস্টরি' অবলম্বনে রচিত 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' শীর্ষক দুটি উপন্যাস। এই উপন্যাস দুয়ে ভূদেবের অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা হিন্দু মুসলমান ঐক্যের পরিকল্পনায় কীভাবে বাহিত হয়েছে সে আলোচনার আগে ইসলাম ধর্ম ও মুসল-

* 'গো হিংসা' নিয়ে হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। 'খরে বাইরে'র (১৯১৬) নিখিলেশের রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কথাই বসিয়েছেন, 'নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কি? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে।…ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয়, তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।'

মান সমাজের প্রতি তাঁর প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

উনিশ শতকের সন্ধান-সংশয়-বিশ্বাস-বিতর্কের কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা এবং ধর্মীয় আচার-আচরণের বিষয়গুলি যুগোপযোগী করে তোলায় তাঁর সকর্মক ব্যক্তিত্বকে পরিচালিত করেছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে ভূদেবের গভীর নিষ্ঠা সুপরিজ্ঞাত। 'ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতেই সমাজের জন্ম ও রক্ষা'[৭]—এমন বিশ্বাসে আজীবন তিনি হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালনে যত্নবান থেকেছেন। সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরও এ বিষয়ে সচেতন দানে তাঁর সবিশেষ প্রযত্নের স্বাক্ষর রয়েছে 'আচার প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ' দুটিতে। কিন্তু হিন্দুধর্মের আত্যন্তিক নিষ্ঠার মধ্যেও ভারতের বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে নিয়ে একটি মহাজাতি গঠনের আবেগ অনুভূতি ভূদেব এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। বিরোধ ও অন্যাভিমুখিতার পরিবর্তে মুসলমান ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গেছেন বরাবর।

রাজা রামমোহনের এক ব্রহ্মের উপাসনায় ধর্মীয় বৈরিতা দূর করার আকাঙ্ক্ষাই ছিল গভীর। তিনি বেদ-কোরান বাইবেল তিনটি প্রধান ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, 'এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং মানবের হিতসাধন ঐ তিন শাস্ত্রের সাধারণ উপদেশ।'[৮] ভূদেব পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস রেখে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছেন নিষ্ঠা সহকারে। এই বিশ্বাস ও নিষ্ঠার অবস্থান ভূমিতে দাঁড়িয়েই 'রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলার অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ'[৯] ভূদেব 'আচার প্রবন্ধের' 'ধর্মচর্যা' প্রবন্ধে অকৃত্রিম বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেছেন,

> 'পৃথিবীতে যত পেগম্বর বা নরদেব এ পর্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধহয়।'

ভূদেব চরিত অনুসরণ করে জানা যায় যে, ডাফ সাহেব ভূদেবকে ফরাসী গ্রন্থকার ভলটেয়ারের লিখিত 'মহম্মদ' বইখানির ইংরেজি অনুবাদ পড়তে দেখেন। পয়গম্বর মহম্মদ সম্পর্কে ঐ উক্তি হয়ত সেই পাঠেরই ফসল। বৃহৎ স্বরূপ উপলব্ধির জন্য মানসিক সামর্থ্য আবশ্যক। নিজের সীমিত পারিপার্শ্বিক ভূমি থেকে বৃহৎ জগতের বিচিত্র দেশ-জাতি-ধর্মের স্বরূপকে দেখতে হলে শুধু আগ্রহই বড়ো কথা নয়, মহৎ অভিপ্রায়টিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভূদেবের অভিপ্রায়টি অভিব্যক্ত করেছেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। ভূদেব লিখিত 'সামাজিক প্রবন্ধের' মূল্যায়নে তিনি লিখেছেন,

'ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য দেশভক্তি এবং সম্মিলনের ও উত্তমের মহামন্ত্র স্বরূপ।'[১০] পরজাতি বিদ্বেষ এবং পরাজিত-পীড়ন স্বজাতি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত নয়—এই মহামন্ত্রকে একমাত্র জেনে ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধে'র বিভিন্ন অধ্যায়ে মুসলমান সমাজের গতি প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, মুসলমান ধর্ম ও সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে ভারত ভূখণ্ডের ইতিহাসে মুসলমান সমাজের স্থানটি সুচিহ্নিত করেছেন। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব মুসলমান সমাজকে যে ঐক্যবোধে গ্রথিত করেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে সুস্পষ্ট করা যায়: 'ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।'[১১]

'সামাজিক প্রবন্ধে'র 'জাতীয়ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান' অধ্যায়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন,

> 'যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক (উদারচেতা পবিত্রকর্ম্মা) বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবিচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বাসনীয় নহে।'

অতঃপর তিনি স্মরণ করেছেন মুসলমান সমাজের কাছে ভারতবর্ষের ঋণের কথা। লিখেছেন,

> 'মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদের রাজত্ব হইয়াছিল-বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব্বপ্রদেশ-সাধারণ-প্রায় হিন্দী-ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্মশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্যরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহাঋণগ্রস্ত।'

'ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা' অধ্যায়ে পুনর্বার একই বক্তব্য উত্থাপন করেছেন,

> 'ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরেরও অধিককাল মুসলমান-দিগের একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই।'

ভূদেবের সিদ্ধান্তের অনুসৃতি লক্ষ করা যায় বিবেকানন্দের অনুভবে। মানবাত্মার স্বাধীন বিকাশে ইসলাম ধর্ম যে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি সে বিষয়ে বিবেকানন্দ

লিখেছেন,

> 'ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে-সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।'[১২]

ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধের' 'জাতীয়ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান' অধ্যায়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

> 'এখানকারও (ভারতবর্ষের) হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে।...
>
> হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে তাহার সূত্রপাত অনেক-দিন হইতেই হইয়া আসিতেছে।...
>
> জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধহয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটি বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।'

কিন্তু এই মিলনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েই ভূদেব নিশ্চুপ থাকেন নি। হিন্দু মুসলমান মিলনের বাধা সৃষ্টি করার জন্য ইংরেজ যে প্রচেষ্টা করে চলেছে, সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে 'সামাজিক প্রবন্ধে'র উক্ত অধ্যায়ে ভূদেব লিখেছেন, 'উঁহারা সর্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন না হইতে পায়, তাহার যত্ন করেন।' ইংরেজ কীভাবে কখনও হিন্দুকে আদর করেন, কখনও মুসলমানের দিকে ঝোঁক দেন—সেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।... ঈর্ষ্যা করা বৈধ নহে, ঈর্ষ্যা করিলেই উঁহাদিগের (ইংরেজের) অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' ইংরেজের রাজনীতি-সূত্রটি ব্যাখ্যা করে তিনি জানিয়েছেন,

> 'ইংরাজ ভারতবাসীর মধ্যে যদি কাহাকেও অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে। মুসলমানের হাত হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্য লইয়াছেন এবং মুসলমানের মধ্যে সম্মিলন-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অধিক আছে।'

ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রকাশ পায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। সে সময়ে ভূদেব 'পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া, পাপ-ভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি অন্যোন্যের শরীর স্পর্শে অনুরাগী না হইয়া এক সমাজ সম্বদ্ধ এক মতানুগামী'[১৩] থাকা যায়—সেরকম অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এর তিন দশক পূর্বে (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে), দেখা যায় যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় করে তোলার ভাবনায় পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা সমাজ সম্বন্ধের বিষয়টি তাঁর আবেগ অনুভূতির অধীন হয়ে উঠেছিল। অজস্র আনন্দ বেগে ভূদেব 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে স্থান দিলেন শিবাজী ও আরঙ্গেব কন্যা রোসিনারার প্রেমকে। আর্টিস্টের সুনিপুণ কল্পনাযোগে, শিবাজী ও আরঙ্গেবের ঐতিহাসিক সংঘাত অবিকৃত রেখে এই উপন্যাসে তিনি চিরন্তন মানব জীবনের গান সংযোজন করেছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' যুক্ত হয়েছে ইতিহাস প্রীতি এবং অপরদিকে সমাজ সম্বন্ধজাত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারীর প্রেমের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' কাহিনীধারা অনুসরণে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—

শিবাজী কৌশলে আরঙ্গেবের আত্মজা রোসিনারাকে অপহরণ করে স্বীয় পার্বত্য দুর্গে আবদ্ধ করেন। বাদশাহ দুহিতার মর্যাদা রক্ষায় শিবাজীর কঠোর ব্যবস্থা, শিবাজীর পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব রোসিনারার মনে অনুরাগ সৃষ্টি করল। রোসিনারার মনে পিতৃশত্রু শিবাজী অপেক্ষা প্রেমিক শিবাজী জয়ী হল। ইতিমধ্যে আরঙ্গেবের সেনাপতি শিবাজীর বিশ্বাসঘাতক বিতাড়িত অনুচরের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করলে শিবাজী পালাতে বাধ্য হন। রোসিনারা পিতৃগৃহে আনীত হলেন। শিবাজী অনুরক্তা হওয়ার জন্য তিনি পিতার কোপে পড়লেন। রোসিনারাকে পিতামহ সাজাহানের সঙ্গে একত্রে বন্দী-জীবন যাপন করতে হল। সেখানে শিবাজীর মঙ্গল কামনায় বন্দী রোসিনারার বিরহে দিন গোনা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। অতঃপর আরঙ্গেবের কৌশলে শিবাজী, দিল্লীতে বন্দী হলেন। কিছুদিন পরেই শিবাজী নিজেকে মুক্ত করে রোসিনারা সহ দিল্লী থেকে পলায়নের আয়োজন করলেন। শিবাজী রোসিনারাকে তার সঙ্গে গমনের কথা গোপনে দূতী মারফৎ পাঠালেন। কিন্তু রোসিনারা শিবাজীর অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে শিবাজীর স্ত্রী রূপে পিতৃগৃহে থাকাই স্থির করলেন। তিনি শিবাজীকে লিখে পাঠালেন: 'তুমিই আমার স্বামী,...আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে—এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামী সহবাসসুখে বঞ্চিত করিলাম।...তুমিও স্বজাতি বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিলে।'

উদার বিস্তৃত হৃদয় নিয়ে রস সাহিত্যে ভূদেব প্রবেশ করেছিলেন মনুষ্যহৃদয় মূলে অবস্থিত ধর্মাধর্মের আজন্ম সংস্কারকে দূর করতে। কোনও থিয়োরীর দুর্বোধ্য শেল নিক্ষেপ করে নয়, মানব হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত প্রেমের ঝরনা-ধারাকে বহতা রেখেই তাঁর এই আয়োজন। হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য, সে ত স্বার্থান্ধ শয়তানের সভায় বিচার্য। প্রেমের দেবতা মানুষকে শোনায় প্রাণ-গঙ্গার সঙ্গীত। শিবাজী-রোসিনারা প্রেমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ভূদেব সর্বপ্রথম ভেঙেছেন ধর্মান্ধদের ধর্মীয় সংকীর্ণতায় তৈরি ভেদের ধ্বজা। প্রেমের মন্ত্রে আরাধনা করেছেন মনুষ্যত্বের দেবতাকে। যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানীর সত্যোপলব্ধি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়।' 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' প্রেরণা ভূদেবের মানবানুভূতি।

প্রসঙ্গক্রমে রোসিনারা চরিত্র অঙ্কনে ভূদেবের সংস্কার বিমুক্ত প্রসারিত দৃষ্টি আমাদের আলোচনার অপেক্ষা রাখে। মুসলমান রমণী রোসিনারাকে তিনি অঙ্কন করেছেন প্রাচ্যের আদর্শে ত্যাগে তিতিক্ষায় আত্মদানে দীপ্ত কল্যাণী ও মঙ্গলময়ীরূপে। উপন্যাসের পরিণতিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে রোসিনারার এই কল্যাণী মঙ্গলময়ীরূপ। উপন্যাসের সমাপ্তিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রামদাস স্বামী শিবাজীর কাছে লিখিত রোসিনারার পত্রটি পাঠ করে বলেন, 'যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন দ্বারা পাতিব্রত্য রক্ষা করেন তাঁহারাও ইঁহার ন্যায় পতি-পরায়ণা নহেন।' রোসিনারা চরিত্রটি আকস্মিক নয় প্রাচ্যের মহীয়সী নারীর আদর্শে অঙ্কিত করা চরিত্র। ভূদেবের অকৃত্রিম পর্যবেক্ষণ শক্তিই এক্ষেত্রে সক্রিয় থেকেছে। 'সামাজিক প্রবন্ধের' 'পাশ্চাত্যভাব—উন্নতিশীলতা' অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'মহম্মদ এবং আয়েসা অথবা আলি এবং ফতেমার চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর ন্যায় পূর্ণসর্বাঙ্গ না হইলেও ঐ চরিত্রগুলিতে অনেকটা উৎকর্ষ আছে।' ভূদেব রোসিনারা চরিত্র অঙ্কনে নারীর এই উৎকর্ষ রূপকেই আশ্রয় করেছেন।

ভূদেবের 'সফল স্বপ্ন' গ্রন্থেও ভারতীয় ঐক্যবুদ্ধি এবং সংহতিবোধই বড় হয়ে উঠেছে। যে গজনবী মহম্মদ কর্তৃক 'ভারতভূমি সর্বপ্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকারসম্ভুক্ত' হয় তাঁর পিতাই হলেন 'সফল স্বপ্নের' নায়ক সাবক্তাগীন। চরিত্রের মহৎ আদর্শ অঙ্কন করতে তিনি বেছে নিলেন ইতিহাসের এমন মুসলমান চরিত্র যার বংশধরের দ্বারা হিন্দু ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এও ত সঙ্কীর্ণতাবিমুক্ত ভূদেবের সম্মিলন প্রাণতারই সাক্ষর। ভারতীয়ত্ব বোধে আত্মস্থতা।

বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে অপক্ষপাত দৃষ্টি, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধা—এসব কথাই একমাত্র নয়। আসলে প্রকৃত ধার্মিক পরধর্মের প্রতি সর্বদা সহানুভূতিশীল ও সহিষ্ণু থাকেনই। কখনই তিনি পর-ধর্ম সম্পর্ক বিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারেন না। ভারতের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি মহাজাতি গঠনের জন্য কত বেশি আবশ্যক ভূদেবের সাধনা আমাদের সেইদিকেই ইঙ্গিত দেয়। ভারতের বিভিন্ন ধর্মবলম্বীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদান জাগিয়ে তোলার ব্যাকুলতাই ভূদেবের সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুভূত হয়।

ধর্ম সম্পর্কে ভূদেব আস্থাবান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পিতৃমাতৃহীন শিশু যেমন অনাথ, ধর্মহীন মনুষ্য-সমাজও তেমনি অনাথ হয়ে পড়ে। 'মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতামাতাও যাহা, মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাহা।'[১৪] ভূদেবের এরকম বিশ্বাসই বিবেকানন্দে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এবং সে কারণেই ধর্মের মধ্যে বিবেকানন্দ ভ্রষ্টতা দেখেন নি, দেখেন মানুষের মধ্যে; যারা ধর্মকে নিয়ে অধার্মিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষের অসহায়তা বাড়িয়ে তোলে। ভূদেবের কাল আমরা পেরিয়ে এসেছি বহুদিন। কিন্তু ভারতের সংহতি ও ঐক্য সাধনায় ভূদেব এখনও পথনির্দেশকরূপে দাঁড়িয়ে আছেন। বর্তমান ধর্ম নিয়ে মাতামাতির কালে বিবেকানন্দের ভাষায় ভূদেবের প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক।

'···We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindu, The Mahomedan, the Christian, all have trampled them under foot···In every country the evils exist not with but agaist religion. Religion therefore, is not to blame, but men।'[১৫]

সূত্র নির্দেশ

১. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২. আত্মজীবনী [চতুর্দশ পরিচ্ছেদ]—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. [৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯, ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মসভায় বক্তৃতা]। বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা—হরপ্রসাদ মিত্র—থেকে গৃহীত।
৪. [মার্চ, ১৮৯৪, রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠি—বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড] ঐ।
৫. [গো জীবন—মীর মশাররফ হোসেন] সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২খণ্ড, ২৯-নং গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
৬. রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় —থেকে গৃহীত।
৭ সামাজিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
৮. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৯. [ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দেহান্তে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ লিখিত] ভূদেব রচনা সম্ভার—প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা থেকে গৃহীত।
১০ [ভূদেব চরিত, ৪৩ অধ্যায়, ৩য় ভাগ]—ঐ।
১১. নিখিলেশের আত্মকথা—ঘরে বাইরে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—পরিশিষ্ট—স্বামী বিবেকানন্দ।
১৩. সামাজিক প্রবন্ধ—ইংরাজাধিকার—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
১৪. ঐ।
১৫. [মার্চ, ১৮৯৪, রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠি—বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড] বিবেকান্দের সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা—হরপ্রসাদ মিত্র থেকে গৃহীত।

গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড. কান্তি গুপ্ত-র পেশা অধ্যাপনা

ডাঃ মহম্মদ আবদুল ওয়ালি

পরিচিত জনদের অতি প্রিয় 'মাটির মানুষ' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চর্মরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ ওয়ালির জীবনাসান ঘটেছে মাত্র কিছুকাল আগে, ১৯৯৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত পাড়াগাঁ খড়িবেড়িয়ায় ডাঃ ওয়ালির জন্ম। অত্যন্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট্‌ অফ মেডিক্যাল সায়েন্সস্‌ থেকে চর্মরোগের উপর প্রথম ডক্টরেট্‌ ডিগ্রি লাভ করেন তিনিই।

১৯৭৭ সালে ডাঃ ওয়ালি WHO বৃত্তি লাভ করেন এবং সেইসূত্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিদ্বজ্জন মহলে তাঁর মতামত বিনিময়ের সুযোগ হয়। সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি ইত্যাদি দেশে ট্রপিক্যাল ডিজিজ্‌ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর আলোচনা বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা লাভ করে। ১৯৭৮ সালে তিনি বিলেত থেকে FDS ডিগ্রি লাভ করেন।

ডঃ ওয়ালি কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্মরোগ বিভাগের বিশিষ্ট শিক্ষক হিসাবে দীর্ঘদিন এই বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর প্রশ্নপত্রকারক, পরীক্ষক এবং মডারেটর হিসাবেও কাজ করেন।

কর্মক্ষেত্রে সফল ডঃ আবদুল ওয়ালি চিকিৎসা ছাড়াও বহু জনহিতকর এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটিই তাঁকে মাদার টেরেসার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।

১৯৮৯ সালে ডাঃ ওয়ালি IADYL-এর সর্বভারতীয় পর্যায়ের সভাপতির পদে ভূষিত হন। মাঝে মধ্যেই তিনি বেতার ও দূরদর্শনে চর্মরোগ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন করতেন। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকাতেও প্রকাশিত তাঁর কোন কোন প্রতিবেদন লক্ষণীয় ছিল।

শ্রীমতী মরিয়মের সঙ্গে ডঃ ওয়ালি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৫৯ সালে। মরিয়মের পিতা প্রয়াত ব্যারিস্টার ওমরউদ্দিন আহমেদ তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ছিলেন। ডাঃ ওয়ালির দুই পুত্রসন্তান ইমরান ও কামরান বর্তমানে যথাক্রমে চর্মরোগের স্নাতকোত্তর বিভাগে এবং MBA পাঠক্রমে রত।

বিদ্যাসাগর বিষয়ে ভুল তথ্য

চতুরঙ্গ ৪ আগস্ট ১৯৯২ সংখ্যায় 'বিদ্যাসাগরের বাড়ি' (শ্রীঅমিয়কুমার সামন্ত) ও 'বাংলা পরিভাষার সূচনাকাল ও বিদ্যাসাগরের পরিভাষা চিন্তা' (শ্রীঅশোক রায়) শীর্ষক লেখাদুটির জন্য লেখকদ্বয় ও পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ। কয়েকটি কথা জানানোর জন্য এই চিঠি। ছাপলে বাধিত হব।

শ্রীসামন্ত লিখেছেন (পৃ. ২৮২) যে "বিদ্যাসাগর তাঁর কন্যাসমা প্রভাবতীর স্মৃতিতে 'প্রভাবতী সম্বোধন' নামক মর্মস্পর্শী পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন।" এই সংবাদে দুঃখজনক ত্রুটি আছে। 'প্রভাবতী সম্বোধন' নয়, পুস্তিকাটির নাম 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। এবং এটিও বিদ্যাসাগর "প্রকাশ" করেন নি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির লেখা থেকে জানা যায় যে প্রভাবতীর মৃত্যুর মাস তিনেকের মধ্যে বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধটি লেখেন (১৮৬৯), নিজের কাছেই রেখে দেন ও মধ্যে মধ্যে বিরলে তিনি এটি পড়তেন। এটি লিখে ছিলেন নিজের জন্য, প্রকাশের জন্য নয়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সুরেশচন্দ্র এটি আবিষ্কার করেন ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল এই পুস্তকটি পড়ে লিখেছিলেন, "এখানে আমরা যেন মানবহৃদয়ের একটি নিভৃত গোপনকক্ষে প্রবেশ করিয়াছি যেখানে প্রবেশের অধিকার আমাদের নাই···ইহাতে মৃত মহাত্মার অনুমতি ছিল না, আমরা যেন সত্যই অন্যায় কাজ করিয়াছি।"[১] এতগুলো কথা বললাম এই জন্য যে বিদ্যাসাগর ও প্রভাবতী পর্ব যাঁরা জানেন, এই প্রমাদ তাঁদের কাছে দুঃখবহ।

'বিদ্যাসাগরে পরিভাষা চিন্তা' লেখাটি পড়তে পড়তে ক'টি কথা মনে হয়েছে। পৃ. ২৯৪ : museum-এর বাঙলা করেছিলেন বিদ্যাসাগর 'চিত্রশালিকা'—শ্রীরায় বলেছেন এটি একটি অসফল পরিভাষা, কেননা "মিউজিয়াম তো শুধু ছবির সংগ্রহশালা নয়···" ইত্যাদি। খুব সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর এ কথা জানতেন যে মিউজিয়ম শুধুই ছবির সংগ্রহশালা নয়। আসলে শ্রীরায় হয়ত খেয়াল করেননি যে, 'চিত্রশালিকা' শব্দে 'চিত্র' অর্থ ছবি নয়, এর অর্থ 'অদ্ভুত বস্তু'।[২] Church'-এর পরিভাষা নিয়ে মনে হয় বিদ্যাসাগর নিজেই হয়ত দোটানায় ছিলেন। সেই জন্যেই 'দেবালয়'-এর সঙ্গে "ঈশ্বরের উপাসনা স্থান", "গির্জা" প্রতিশব্দগুলিও উল্লেখ করেছেন।[৩] ব্যুৎপত্তিগত বিচারে ইংরেজি church শব্দটি যে মূল গ্রীক শব্দ [Kyri (a) kon (doma)→the Lord's house][৪] থেকে এসেছে তার অনুবাদ দেব+আলয় অবশ্যই সুগ্রাহ্য। 'জীবনচরিত' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর mineral এর বাঙলা পরিভাষা করেছিলেন 'ধাতু', mineralogy——ধাতুবিদ্যা। তা হলে metal কী হবে? 'বোধোদয়' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর কিন্তু metal অর্থে 'ধাতু' ব্যবহার করেছেন। 'আকর' কথাটিও 'বোধোদয়ে' আছে, অর্থাৎ mineral হবে 'আকরজ'। এই বিবর্তনে অক্ষয়কুমার দত্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিছু হাত ও দান থাকতেই পারে। বিদ্যাসাগর কৃত কিছু পরিভাষা নির্দেশ করে কী পরিমাণ সাহস নিয়ে বাঙলা গদ্যের সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা অবস্থায় তিনি পরিভাষা গঠনে হাত দিয়েছিলেন। যেমন : আধিশ্রাহ্নিক ব্যবধি (focal distance); focus-এর অর্থ যাই হোক, এসেছে লাতিন শব্দ থেকে যার অর্থ অগ্নিস্থান বা চুল্লী বা অধিশ্রয়ণ।[৫] "আখ্যানমঞ্জরী" ৩য় ভাগে একটি গল্পের নাম 'স্বপ্নসঞ্চরণ'—somnambulist সাইরিলোর আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা। আমরা পেলাম আরেকটি পরিভাষা। তালিকা আর বড় করছি না। এ ছাড়াও ক'টি প্রয়োজনীয় কথা সবিশেষ গুরুত্ব পায়নি। এক, বিদ্যাসাগর পরিভাষা গঠন ও চয়ন শুরু করেছিলেন পদ্ধতি অনুসারে। দুই, এই প্রয়াসে বিদ্যাসাগর অবশ্যই মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমার দত্তের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিন, নিজের সম্বলিত পরিভাষা নিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত আদৌ ছিলেন না। চার, পরিভাষা চিন্তা বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতিতে যথেষ্ট আশ্রয় পেয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

(১) সাহিত্য বিতান, ১৩৪৯ (পৃ. ৬২)

(২) জীবনচরিত (দ্রষ্টব্য ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ), বিদ্যাসাগর ; বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭৯), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) দ্রষ্টব্য : দৃষ্টব্য ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ তালিকা, জীবনচরিত, বিদ্যাসাগর।

(৪) উৎস : The Random House Dictionary of the English Language (1983). Random House, Inc., New York. পৃ. ২৬৫।

(৫) উৎস : ঐ, পৃ. ৫৪৯।

ইতি। নিবেদক
দেবব্রত ঘোষ
অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স
নয়া দিল্লি ১১০০২৯

প্রসঙ্গ কবি অমিয় চক্রবর্তী

নভেম্বর মাসের 'চতুরঙ্গ'-তে 'কবি অমিয় চক্রবর্তী' শিরোনামে পুলক নারায়ণ ধর-লিখিত যে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে গোটা দুই তথ্য একটু অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়, অর্থাৎ কবি অমিয় চক্রবর্তী কি শেষ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদটি পান নি? আর রবীন্দ্রনাথ কি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলার বাইরে' চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত খুব সহজ মনে মেনে নিয়েছিলেন?

এটা ঠিক যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তী অধ্যাপক পদের জন্য প্রথমে নির্বাচিত হননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ কমিটি নাকি 'উপযুক্ত আবেদনকারীর অভাবেই কাউকেই···নিয়োগ করতে পারে নি'। বলা বাহুল্য অমিয় চক্রবর্তী (এবং রবীন্দ্রনাথও) এই প্রত্যাখ্যানে স্বাভাবিক কারণেই খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই প্রত্যাখ্যানের ঘটনার পর অমিয় চক্রবর্তী ঐ সময়ই অনুষ্ঠিতব্য শান্তিনিকেতনের একটি অনুষ্ঠানে—যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করার জন্যে—উপস্থিত থাকতে প্রথমে রাজী হননি, এই অন্যতম কারণে যে ঐ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক নিয়োগ কমিটির একাধিক সদস্য (যাঁরা কিছুদিন আগেই অমিয় চক্রবর্তীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপক পদের জন্যে মনোনীত না করার ব্যাপারে জড়িত ছিলেন) নিমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন। এহেন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ একটি অত্যন্ত বিচক্ষণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বিশেষভাবে অনুরোধ করে একটি চিঠি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভারতীর (বা তাঁর নিজের চোখে) অমিয় চক্রবর্তীর মর্যাদা যে কতটা উঁচুতে সেটা সে অনুষ্ঠানে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার পরিকল্পনা করলেন। সে পরিকল্পনা আর কিছু নয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যাঁরা সেখানে মক্কোপরি বসবেন (যেমন তদানীন্তন ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গ্যায়ের, বিচারপতি হেওয়ারসন, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ নিজে) তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পাশেই অমিয় চক্রবর্তীরও বসার ব্যবস্থা হল। এ ব্যবস্থার ফলটি হল চমকপ্রদ। কিছুদিন আগেই প্রত্যাখ্যাত অমিয় চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদটির জন্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন। প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হলেও কিছু পরেই যে অমিয় চক্রবর্তী নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন এ তথ্যটি পুলকনারায়ণ ধরের চিঠি বা সে চিঠিতে উল্লেখিত টেপ রেকর্ডের বিবরণে ধরা পড়ে নি। এই প্রথমে প্রত্যাখ্যাত ও পরে নিযুক্ত হবার ঘটনাটি ঘটে দেখা যায় ১৯৪০ সালের এক সময়ে। শ্রীধরের টেপ রেকর্ডের সাল ১৯৭৮। সন্দেহ নাই গোড়ার প্রত্যাখ্যানের গ্লানি ও ক্ষোভ অমিয় চক্রবর্তী প্রায় ৪০ বছর পরও ভুলতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, প্রথম প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলার বাইরে' চলে যাবার সিদ্ধান্ত যে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ মনে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি সেটা তাঁর তখনকার (২৯ জুলাই ১৯৪০ তারিখে লিখিত) এই চিঠিটি থেকেই বোঝা যায় যেখানে তিনি লিখছেন—'অমিয়, তোমার চিঠি পেয়ে কীরকম বেদনা বোধ করলুম তা বলতে পারিনে। তোমাকে কাছে রাখতে পারব একান্ত আশা করেছিলুম। তবু একথা বলতেই হবে বাংলাদেশের কুটিল চিত্তের জাল ছিন্ন করে তুমি যে চলে যাচ্ছ এ হয়তো মোটের উপর ভালোই হোলো। নইলে একদিন অশ্রুশোচনা করতে হোত। কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা তুমি ৭ই অগস্টের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকো। আর কোনও কারণ নয়—তোমাকে আমি যে অন্যদের চেয়ে শ্রদ্ধা করি সেটা দেখাবার সুযোগ পেতুম। তোমার সম্মান তুমি এখানে পেতে। তুমি হার মেনে যেয়ো না চলে। আমাদের সভায় তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। এখানে তোমার এই শেষ কাজ করে যেয়ো। অন্যেরা যেন কোন মতে মনে না করে যে বাংলাদেশ থেকে তুমি অপমানিত হয়ে গেলে। শান্তি-

নিকেতনের সম্মানের তো মূল্য আছে। ইতি ২৯।৭।৪০
তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

উপরোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া যাবে অধ্যাপক নরেশ গুহ সম্পাদিত ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবির চিঠি কবিকে' শিরোনামের ধারাবাহিক রচনার ২ নভেম্বর (১৯৯১)-এর 'দেশ'-এ প্রকাশিত অংশটিতে। তবে অধ্যাপক গুহ রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত এই চিঠিখানার সংখ্যা সেখানে দিয়েছেন ১০৫, 'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ডে এ চিঠির সংখ্যা দেখা যায় ১০২।

ইতি। নিবেদক
কল্যাণকুমার দত্ত
বি-১১।২০ কল্যাণী নদীয়া-৭৪১২৩৫

শিক্ষা-সংকট নিয়ে কিছু

অশোক মিত্র কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ সাহেবের বিবেকী প্রবন্ধের সাপেক্ষে কিছু কথা, কিছু উদ্বিগ্ন উচ্চারণের তাগিদ অনুভব করলুম।

প্রাক-স্বাধীনতা কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বহু শিক্ষা-কমিশন গঠিত হয়েছে। কয়েক টন কাগজ নষ্ট করে, কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্টগুলি নিয়ে ঠাণ্ডাঘরে বসে রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবিদের বিতণ্ডা চলেছে, তারপর সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে 'ঠাণ্ডা-ঘরেই'। কিন্তু দেশের ছবি কিছুমাত্র পাল্টায় নি, বরং অবনতি হয়েছে।

সারা ভারতবর্ষ নয়, পশ্চিমবাংলার কথাই বলব। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে রাজনৈতিক দলাদলির বিষ-ক্রিয়া পশ্চিমবাংলার আবহাওয়ায় যতখানি প্রবল, পৃথিবীর অন্য কোথাও ত বটেই, এমনকি ভারতবর্ষেরও অন্যান্য রাজ্যে তা এমন সর্বব্যাপী নয়। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানির রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও অলিম্পিকে তার কোনও প্রতিফলন ঘটে না, সেসব দেশের শিক্ষাজগতের মান নিম্নগামী হয়না, সেসব দেশের মানুষ স্বাস্থ্যের ন্যূনতম নিরাপত্তা পায়।

অথচ এই পশ্চিমবাংলায় আমরা দেখেছি, রাজ্যের শাসকদলের মনোনীত না হওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বিঘ্নে কার্যকাল কাটাতে পারেন না, কলকাতার কলেজে ছাত্র-নির্বাচনের জন্য এক রক্তাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ছাত্র-নির্বাচন-বন্ধের জন্য প্রশাসনের কাছে পুলিশকে আবেদন জানাতে হয়। সারা পশ্চিমবাংলা যখন বিদ্যুৎ সংকটে মুমূর্ষু সেই সময়েই রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট ছাত্র-ইউনিয়ন আলোর বন্যা বইয়ে শত শত বাস ও অন্যান্য যানবাহন নিয়ে ব্রিগেডে সমাবেশ করে। স্বদেশের শিক্ষা-ক্রম বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেন রাজনৈতিক নেতারা। তাঁরা সবকিছুই জানেন। দুর্গাপুজোর নৈবিদ্যি থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত তাঁদের অভিজ্ঞতা। স্কুল-স্তরেও ইউনিয়নের প্রস্তাবও উঠেছিল। কেন? কার স্বার্থে? মনে হয়, ভোটাধিকারের ন্যূনতম বয়স যদি ছয় বৎসর করা হয় তবে পৃথিবীতে কোনো শক্তির সাধ্য নেই যে পশ্চিম-বাংলায় স্কুল-স্তরে ছাত্র-ইউনিয়নকে আটকাতে পারবেন। কারণ আমরা দেশে মানুষ চাই না, কর্মী চাই, ক্যাডার চাই। আমরা দেশের উন্নয়ন চাই না, গদির স্থায়িত্ব চাই। গদি পাকাপাকিভাবে রাখতে গেলে এমন কিছু মানুষ দরকার যাঁরা বুঝবেন কম, প্রশ্ন করবেন কম, মানবেন বেশি, এক ভক্তের দল। ভক্তিবাদের দেশ আমাদের। ভক্তিবাদ যুক্তি মানেনা। এককালে ধর্ম আমাদের যুক্তিহীন ভক্তিবাদী করে তুলেছিল, আজ ধর্মের স্থান নিয়েছে রাজনীতি। আজকের রাজনীতির সামনেও কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললে হত বিধর্মী, রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললে হয় প্রতিক্রিয়াশীল। আজকের এই শিক্ষার সংকটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা হলেন আপামর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। জানি সেখানেও বিভেদ আছে। সুবিধা-বাদের ঝোঁক আছে। তবু প্লেটোও যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁর বিপরীতে অ্যারিস্টটল, ক্রুনোও ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস এগোয় এই অ্যারিস্টটল, ক্রুনোদের জন্যেই।

আজ শিক্ষা জগৎকে সত্যিই যদি বাঁচাতে হয় তবে অবশ্যম্ভাবীভাবে যেগুলো দরকার তা হল : ১। শিক্ষাজগৎ থেকে দলাদলির রাজনীতির সম্পূর্ণ বিযুক্তি। ২। বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে এসে একটা সঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রমের প্রবর্তন। ৩। সর্বোপরি, সমস্ত স্তরের শিক্ষক-অধ্যাপকদের ট্যুশান-ইণ্ডাস্ট্রির কিংবা নোট-বই-শিল্পের পিছনে না দৌড়ে 'মানুষ গড়ার কাজে' আত্মনিয়োগ করা। শিক্ষক সম্প্রদায়ই

সেই কারিগর শিক্ষাসৌধের শেষ আঁচড়টি যাঁরা কাটেন। সেইজন্যই সমাজে তাঁরা একটা স্বতন্ত্র সম্মান পান। কিন্তু সে সম্মান যদি হারান তবে তার দায়ভাগ তাঁদেরই। সেই হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য অবশ্যই কিছু বেশি মূল্য দিতে হবে। নইলে, ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনা, আজকের এই গাফিলতি, এই ফাঁকির মাশুল বইতে হবে আগামী বহু প্রজন্ম ধরে।

ইতি। নিবেদক
অনীশ লাহিড়ী
জগাছা, হাওড়া

প্রসঙ্গ হিন্দু মৌলবাদ

'চতুরঙ্গে'র ডিসেম্বর ১৯৯২ এবং জানুয়ারি ১৯৯৩ সংখ্যা দুটিতে যথাক্রমে প্রকাশিত অমলেন্দু দে লিখিত 'ধর্মীয় মৌল-বাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা' বইটির শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সমালোচনা এবং সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্তের 'সত্যপালন বনাম জনতাতোষণ' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা : 'আমাদের পাপই ইংরাজের বল।' এখানে 'পাপ' মানে আমাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি। এপ্রসঙ্গে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্প্রদায়িক বিভেদ কী ভাবে বিরোধে পরিণত হচ্ছে তার বিবরণ আছে এর পটভূমিতে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়ায় যারা কোনদিনও গোরু খায়নি তারাও গোহত্যা করল। নিখিলেশ অঙ্কের ধর্মের ব্যাপারে হাত দেওয়ার বিরোধিতা করেছে। এই চিন্তার অনুসৃতি আছে সুরজিৎ দাশগুপ্তের রচনায়। মুসলিম আইনের ব্যাপারে হিন্দুদের নাক গলাতে তিনি বারণ করেছেন।

'ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা' বইটিতে শ্রীদে বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ও সেসবের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দের মতানুসারে বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদের প্রতিক্রিয়াতে ভারতে হিন্দু মৌলবাদ শক্তি পাচ্ছে এ ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে বম্বে ও সুরাটে যা ঘটেছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদের কি কোনও সম্পর্ক আছে? সম্পর্ক থাকলে বম্বে সুরাট থেকে দলে দলে হিন্দুধর্মাবলম্বী তামিল ওড়িয়া বিহারীও পালিয়ে আসত কি? আর বাংলা-দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে-বিদ্বেষ পশ্চিম বাংলায় ছড়ানো হচ্ছে তা বাংলাদেশের পূর্ব সীমানার ওপারে অর্থাৎ অসম মেঘালয় ত্রিপুরায় অন্যরকম হয়ে গেছে —ওই অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলা-ভাষী মাত্রেই বঙ্গাল বা বিদেশী। ভারতের বৃহত্তরঅংশে অনুপ্রবেশকারী বলতে সাধারণভাবে বাংলা-ভাষীকেই বোঝায় একথাটা পশ্চিমবাংলার বাঙালির জানা দরকার। বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলিম অনুপ্রবেশ-কারীদের জন্যে পশ্চিম বাংলায় যদি বা হিন্দু মৌলবাদ শক্তি সঞ্চয় করে কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতে বা হিন্দীভাষী ভারতে হিন্দু মৌলবাদ শক্তি সঞ্চয় করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কতকগুলি কারণে।

এর একটি প্রধান কারণ হল, সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দেউলেদশা এবং তার জন্যে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে বামপন্থী বা জনতা দলের ব্যর্থতা। ভারতের এই রাজনৈতিক শূন্যতা বিজেপির জন্যে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে এবং বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্মকে পুঁজি করে এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে এসেছে। শ্রীদে বা তাঁর গ্রন্থের সমালোচক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে আদৌ ভেবেছেন বলে মনে হয় না।

হিন্দু মৌলবাদের আর একটি কারণ হল অর্থনৈতিক। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে দেশের সবখানে আজ মস্তান বাহিনীর রাজত্ব চলছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাদকদ্রব্য চালানদার, কালোবাজারী, সাট্টাবাজ প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা এইসব মস্তান বাহিনীর পৃষ্ঠপোষক। সারা পৃথিবী জুড়েই আজ অপরাধের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই বাতাবরণ থেকেই মস্তান বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে এবং এরাই মৌলবাদীদের সৈন্যবাহিনী। ঈর্ষাকাতর, হতাশাগ্রস্ত, বিচারহীন, বিশ্বাসে বিবশ ব্যক্তি সহজেই ক্ষমতা-লিপ্সু মৌলবাদীর ভক্ত হয়। জার্মানিতে আর্থ-সামাজিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েই হিটলার ক্ষমতায় এসেছিল এবং তার পরিণাম আমরা দেখেছি।

অধ্যাপক দে গ্রন্থের ভেতরে সূত্র নির্দেশের অংশে লাল

লাজপত রাই, গুরু গোলওয়ালকর প্রমুখের অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এসব উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় যে লালা লাজপত রাই ছিলেন অহিংসা ও শান্তির আদর্শের ঘোর বিরোধী, গোলওয়ালকরের ভারতে থাকবে শুধু হিন্দু ধর্ম ও হিন্দি ভাষা এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এসব উদ্ধৃতির যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেননি। পক্ষান্তরে অধ্যাপক দে যেন বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের হিন্দু মৌলবাদের সাফাই গেয়েছেন। মনে হয়, মৌলবাদের বিশ্বব্যাপী চরিত্র এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-শৃঙ্খল সম্বন্ধে শ্রীদে অথবা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কেউই সচেতন নন।

এখানে আমি সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের প্রসঙ্গে আসি। এই সূত্রে শ্রীদাশগুপ্তের লেখা বহু বিতর্কিত 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থটির কথাও এসে গেছে। কারণ আমাদের সংবিধানে 'মৌল অধিকার', 'মৌল সূত্র' প্রভৃতি কথা আছে। তাহলে হঠাৎ আজ নিন্দা অর্থে আমরা 'মৌলবাদ' কথাটা ব্যবহার করছি কেন? আমার জ্ঞান অনুসারে 'মৌলবাদ' শব্দটির সংজ্ঞার্থ শ্রীদাশগুপ্তই বাংলায় প্রথম দিয়েছেন 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে এবং 'চতুরঙ্গে'র প্রবন্ধটিতেও এবিষয়ে তিনি ইংরেজিতে লেখা আরও কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই যে অধিকাংশ মার্কিন এনসাইক্লোপেডিয়াতেই মৌলবাদ বা 'ফাণ্ডামেণ্টালিজম' বলে একটি 'এনট্রি' আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্যে ধর্মকে ব্যবহার করে তখন সেই ব্যবহারটাই মৌলবাদ। শ্রীদাশগুপ্ত স্বাভাবিক কারণেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে মৌলবাদীরা ক্ষমতায় এলে দেশে এক ধর্ম থাকবে, কিন্তু এতে বাঙালি মৌলবাদীদের খুশি হওয়ার কারণ নেই, কেননা মৌলবাদীদের দেশে শুধু একটিই ভাষা থাকবে, আডবানীর গুরুজী আগেই এই এক-ভাষা-সূত্রটি উপস্থাপন করেছেন, এক আইন থাকবে এবং সেই এক আইন নতুন করে প্রণয়ন করা হবে যাতে পুরুষকে বহু নারী ভোগের অধিকার দেওয়া হবে, হিন্দু মৌলবাদীদের নীতি নির্ধারক স্বামী মুক্তানন্দ সরস্বতী হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই বলে ফেলেছেন যে একজন পুরুষের অন্তত ২৫ জন নারী থাকবে অর্থাৎ সার্বভৌম পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, আর স্বামী বামদেব বলে ফেলেছেন যে বর্ণাশ্রম প্রথা অর্থাৎ সার্বভৌম ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হবে। অবশ্য বিজেপির নেতারা এখনই তাঁদের সব পরিকল্পনা প্রকাশ করছেন না এবং যেসব সূত্র ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেছে সেগুলি চাপা দিতে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে যেসব কথা বলছেন সেগুলো শুধুই নির্বাচনের আগের কথা। ক্ষমতায় এলে বাকি সব কথা আসবে। ইয়ে ত সিরেফ ঝাঁকি হ্যায়, বহুত কুছ আভি বাকি হ্যায়। বাকি কথাগুলির একটি হল—যে-নির্বাচনে জিতে মৌলবাদীরা ক্ষমতায় আসবে সেটাই হবে ভারতের শেষ নির্বাচন। গুরু গোলওয়ালকরের গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি উক্তি অধ্যাপক দে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থের ২২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় যার মর্মার্থ হল গণতন্ত্র একটা অর্থহীন ব্যবস্থা। সুতরাং 'চতুরঙ্গে'র পাঠকপাঠিকাদের, বিশেষত পাঠিকাদের এবং তাঁদের পরে সাধারণ বাংলাভাষী পাঠকদের ভেবে দেখতে বলব যে তাঁরা কী রকম দেশ চান, কাদের নেতা বা প্রশাসক রূপে চান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে ভারতবর্ষ ছিল খণ্ডবিখণ্ড এক ভূখণ্ড। অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমরা অতীতের সেই খণ্ডবিখণ্ড ভারতবর্ষের দিকে ফিরে যাচ্ছি কি? শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ইতি। নিবেদক
দেবদাস জোয়ারদার
বারাসত সরকারি মহাবিদ্যালয়, দঃ চব্বিশ পরগণা

With best compliments

TULSYAN IMPEX PRIVATE LIMITED

(RECOGNISED EXPORT HOUSE)
MANUFACTURER & EXPORTER OF
LEATHER & LEATHER GOODS

Address : 5A, ROBINSON STREET, CALCUTTA-700 017
Phone : 247-5252 (4 Lines)
247-2687
Fax : 91-33-403043
91-33-402208
Telex : 21 4042 TIPL IN